ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. XIII, No. 2, JULY 2025 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ সংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

J- 047

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. XIII, No. 2, July 2025 AD

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
[Included in the UGC CARE List]

ত্রয়োদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

Debra Thana S.K.S. Mahavidyalaya
CENTRAL LIBRARY
Estd.-2006
Chakshyampur, Paschim Medinipur

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা যাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. XIII, No. 2, July 2025 AD

সম্পাদকীয় ৯

স্মরণালেখ্য

চিত্তব্রত পালিত (১৮ অক্টোবর, ১৯৪১ – ১৪ জুন, ২০২৫)
নির্বাণ বসু ১১

প্রবন্ধ

বাংলা ভাষায় আসামচর্চা
সুব্রত রায় ১৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইতিহাসে দীনেশচন্দ্র সেনের অবদান
মিঠুন দত্ত ৩৫

জাত, জমি ও ধর্ম: মেদিনীপুরের সদ্‌গোপ সমাজ
(খ্রি. ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দী)
অভিজিৎ সাধুখাঁ ৬৭

হুগলি জেলায় জ্বরঘটিত মহামারি (১৮৬০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ)
সন্দীপ কুমার পাল ৯২

বাগদিরাজ থেকে মল্লরাজ: উৎস অনুসন্ধান ও সাংস্কৃতিক উত্তরণ
মিলন রায় ১১৫

ঔপনিবেশিকতা ও কোচবিহার রাজপরিবারের
সাংস্কৃতিক পরিচয় সংকট (১৮৬০-১৯৪৭): একটি সমীক্ষা
প্রজ্ঞাপারমিতা সরকার ১২৮

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও চটকল শ্রমজীবী:
একটি রাজনৈতিক জীবনধারার ইতিবৃত্ত (১৮৯৯-১৯৪৭)
শত্রুঘ্ন কাহার ১৫৩

বিশ্বায়ন ও মতাদর্শ: প্রসঙ্গ জনপ্রিয় সংস্কৃতি
রাহুল বর ও সায়ক মুখার্জি ১৯৩

গ্রন্থ সমালোচনা

পূর্ব ভারতে শিখপন্থের বিকাশ—এক বিচিত্র ইতিহাস
সৌমিত্র শ্রীমানী ২১২

ইতিকথা, বর্ষ ১৩, সংখ্যা ২, জুলাই ২০২৫ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) *পৃ.* ১৫৩-১৯২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও চটকল শ্রমজীবী: একটি রাজনৈতিক জীবনধারার ইতিবৃত্ত (১৮৯৯-১৯৪৭)

শত্রুঘ্ন কাহার*

(প্রাপ্ত: ২৮ জুলাই ২০২৪ খ্রি., গৃহীত: ১৭ মার্চ ২০২৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বাংলার হিন্দিভাষী চটকল শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিবিম্বই লক্ষ করা যায় ভাটপাড়া মিল শহরের শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। একদা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান রূপে পরিচিত ভট্টপল্লী কালক্রমে ঔপনিবেশিক যুগে চটকল শহরে পরিণত হয়। পৌরসভা হিসাবে ভাটপাড়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। মূলত ১৮৯০-এর দশক থেকে উক্ত অঞ্চলের চটকলগুলিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অভিবাসন উক্ত অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি তথা রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অচিরেই ভাটপাড়া চতুর্থ বৃহত্তম পৌরসভায় পরিণত হয়। পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও স্থানীয় করদাতারাই প্রধান ভূমিকা পালন করত, তবে শ্রমজীবীরা করও দিত না এবং পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কোনো ভূমিকাও ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক জীবনকেও রাজ্য, মিল অভ্যন্তরীণ বা স্থানীয় স্তরে ভাগ করে আলোচনা সম্ভব নয় কারণ এই সময়পর্বে এই সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা গড়ে ওঠেনি। মূলত অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ভাটপাড়াতেও ১৯২০-র দশক থেকেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে খিলাফতপন্থীদের হাত ধরে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভাটপাড়া লেবার অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে যেটি পরবর্তীকালে বেঙ্গল চটকল

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরাথানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: skahar0072015@gmail.com

মজদুর ইউনিয়ন নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে পেজেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির মাধ্যমে কমিউনিস্টদের সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আসে। ১৯২৯, ১৯৩৭ ও ১৯৩৯-এর চটকল শ্রমিকদের বিখ্যাত ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৯৪১-এর মহাযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। তবে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন আবার গতি পেলেও স্বাধীনতা ও তৎজনিত দাঙ্গার পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনে সাময়িক ভাটা নেমে আসে। এই সময়পর্বের শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল—শ্রমিক নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিলেন বহিরাগত, চটকলের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে চটকল শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আন্তরিক, শ্রমিকরা এই বহিরাগত নেতাদের অভিভাবক বলেই মনে করত।

সূচকশব্দ

ভাটপাড়া, মিউনিসিপ্যাল, চটকল, শ্রমিক, রাজনীতি

ভূমিকা

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রিষড়ায় প্রথম চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলায় শিল্পায়নের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে হুগলি নদীর উভয় তীরে একের পর এক চটকল স্থাপন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। প্রথম কুড়ি-ত্রিশ বছর এই চটকলগুলিতে বাংলার স্থানীয় বাঙালি শ্রমজীবীদের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা গেলেও, ১৮৯০-এর দশক থেকে ক্রমশ পার্শ্ববর্তী রাজ্য, যেমন বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এমনকি অন্ধ্রপ্রদেশ থেকেও দলে দলে শ্রমজীবীরা এই চটকলগুলিতে ভিড় করতে থাকে। ক্রমশ উক্ত অঞ্চলগুলির জনবিন্যাস, পৌরচরিত্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন অনুধাবনের জন্য প্রয়োজন অনুপুঙ্খ গবেষণার (Micro Study) এবং এই জন্যই ভাটপাড়ার রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রথমত, ভাটপাড়া- জগদ্দল-কাঁকিনাড়া শিল্পাঞ্চলে মিল ও শ্রমিকের সংখ্যা—উভয় দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম চটশিল্প অঞ্চল। দ্বিতীয়ত, এখানে অবাঙালি, আরও নির্দিষ্টভাবে, উত্তর ভারতীয় হিন্দিভাষী অভিবাসী শ্রমিকের আনুপাতিক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। বাঙালি শ্রমিকের

পাশাপাশি কিছু উর্দু, তেলুগু ও ওড়িয়াভাষী শ্রমিক থাকলেও, তাদের সংখ্যা মোট শ্রমিকের আনুপাতিক হারে ছিল নগণ্য। তৃতীয়ত, ভাটপাড়া পৌরসভা এবং বিধানসভা ক্ষেত্র পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র অঞ্চল যাতে অবাঙালি হিন্দিভাষী শ্রমিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। এই সবকিছু মিলে ভাটপাড়া মিল-শহরকে যে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছে তা অনস্বীকার্য।

ভাটপাড়া: ভৌগোলিক পরিচয়

বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া কলকাতা থেকে ৩৫ কিমি উত্তরে গঙ্গানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে ভাটপাড়ার যোগাযোগ সহজসাধ্য। নৈহাটির পার্শ্ববর্তী ভাটপাড়া (আদিনাম ভট্টপল্লী) প্রাচীন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এখানে একের পর এক চটকল গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের প্রথম চটকল কাঁকিনাড়া জুটমিল (১৮৮৪)। ঔপনিবেশিক আমলে বিংশ শতকের গোড়ায় এখানে আরও বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও, ভাটপাড়া মূলত চট অঞ্চল (Jute belt) বলে পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য তার অনেকগুলি রুগ্‌ণ অথবা চিরতরে বন্ধ।

ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ও চিরায়ত শিক্ষাসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নৈহাটি-ভট্টপল্লী-মূলাজোড় শ্যামনগর ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ এবং কালীবাড়ির জন্য প্রসিদ্ধ। আঁটপুর ছিল একটি গ্রামীণ অঞ্চল। জগদ্দল ছিল একদা বিশাল বিশাল অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ধনী ব্যক্তিদের বাসস্থান। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি চটকল ও সংলগ্ন শ্রমিক বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। ঠিক একইভাবে কাঁকিনাড়া, যা ছিল একটি প্রাচীন জনপদ এবং পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সেখানে গড়ে ওঠে অধিকাংশ জুটমিল ও শ্রমিক বস্তি।[১] উনিশ শতকের শেষে ভাটপাড়া পৃথক পুরসভার মর্যাদা পাওয়ার সময় থেকেই ভাটপাড়ার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় প্রধানত, উদীয়মান চটশিল্পের শহর হিসাবে।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, আঁটপুর ও মূলাজোড় (শ্যামনগর) নিয়ে নৈহাটি পুরসভর বাইরে প্রথম ভাটপাড়া পুরসভা (Municipality) গঠিত হয়। পরে সুন্দিয়া গ্রামের পুরোটা এবং স্থিরপাড়া বা থিরপাড়া গ্রামের একাংশ এই পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে এই পুরসভায় ছিল তিনটি ওয়ার্ড—ভাটপাড়া (ওয়ার্ড নং ১), কাঁকিনাড়া (ওয়ার্ড নং ২), জগদ্দল (ওয়ার্ড নং ৩); পরে আঁটপুর ও

মূলাজোড় নিয়ে গঠিত হয় ওয়ার্ড নং ৪।[২] ইতিমধ্যে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় জগদ্দল থানা। নৈহাটি থানা থেকে আলাদা করে ভাটপাড়া পৌর এলাকা ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকা নিয়ে গঠিত হয় এই জগদ্দল থানা।[৩] কালক্রমে ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫টি। এই পুরাতন ২৫টি ওয়ার্ডের সঙ্গে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের সংযোজিত অঞ্চলগুলির ১০টি ওয়ার্ড যুক্ত করে পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫টি। এর ফলে সমগ্র পুরএলাকাটির অধিকাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাভাষী।[৪]

পৌর রাজনীতি—ঔপনিবেশিক পর্ব

ভাটপাড়া নগরীর এই চরিত্রগত রূপের পরিবর্তনের (transformation of character) মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিংশ শতাব্দীর ভাটপাড়ার বিবর্তনের উৎস।

জনসংখ্যা: উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে একের পর এক চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (Demographic) চিত্রই বদলে যেতে থাকে। জনসংখ্যাগত সারণি (সারণি ১) থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৮৯১-১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাটপাড়ার জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথম দশ বছরে (১৮৯১-১৯০১) ৮২.৫৫ শতাংশ এবং পরবর্তী দশ বছরে (১৯০১-১৯১১) ১৩৪ শতাংশ ছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে শতাংশের হারে প্রত্যেক দশকে কিছুটা পার্থক্য হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।

সারণি ১: ভাটপাড়ার জনসংখ্যা

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা	বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৮৯১	১১,৭৬৪	—
১৯০১	২১,৪৬৪	৮২.৪৫%
১৯১১	৫০,৪১৪	১৩৪.০০%
১৯২১	৬৫,৬০৯	৩০.১০%
১৯৩১	৮৪,৯৭৫	২৯.৫০%
১৯৪১	১,১৭,০৪৪	৩৭.৭০%
১৯৫১	১,৩৪,৯১৬	১৫.৩০%

Source: *District Census Handbook North Twenty-Four Parganas, Census of India 2011*, Series 20, Part XII A". Section II Town Directory, Pages 781-783 Statement I: Growth History, Pages 799-803. Directorate of Census Operations V, West Bengal. Retrieved 11 June 2018.

জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ ভাটপাড়াকে খুব দ্রুত বাংলার চতুর্থ বৃহত্তম নগরে পরিণত করে। কলকাতা, হাওড়া ও ঢাকার পরেই ছিল ভাটপাড়ার স্থান। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে স্পষ্টতই বলা হয়—"Needless to say that this absolutely a labour district where most of the people earn their livelihood either by working in the mills or by selling necessities to the mill labourers"।[৫] বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে দলে দলে লোক এই চটকলগুলিতে কাজ পাওয়ার জন্য ভিড় করতে থাকে এবং তাদের বাংলার চটকলে নিযুক্ত হওয়ার পেছনে যে নির্দিষ্ট ছক ছিল, তা সব চটকল অঞ্চলেই কাজ করত, ভাটপাড়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কারখানায় কর্মরত কিছু শ্রমিক ছুটির পর দেশের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় নিজের সঙ্গে আত্মীয়-পরিজন বা গ্রামের লোক নিয়ে আসত এবং কারখানায় তার অধীনে কাজে ঢুকিয়ে দিত। এরাই 'সর্দার' নামে অভিহিত হত। চটকলে কাজে নিযুক্তির প্রথম পর্বে শ্রমিকরা অনেকটাই সর্দারদের উপর নির্ভর করত। এইভাবে একটা দাতা-গ্রহীতার (client-patron relationship) সম্পর্ক তৈরি হত, যা অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভাটপাড়ার শ্রমিক জগৎকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল।

স্থানীয় বনেদি ভদ্রলোকের স্বার্থ, ইউরোপীয় মিলমালিক ও ম্যানেজারদের স্বার্থ এবং বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকের স্বার্থ ছিল ভিন্ন এবং অনেক সময়ই পরস্পরবিরোধী। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা, কর্তৃত্ব এবং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি শ্রেণি ছিল মিউনিসিপ্যালিটির করদাতা (rate-payer) এবং ভোটদানের অধিকারপ্রাপ্ত, তৃতীয় শ্রেণিটি করদানও করত না, ভোটের অধিকারও ভোগ করত না। লক্ষণীয় যে, ইউরোপীয় মিলমালিক ও ম্যানেজাররা শ্রমিক অঞ্চলের রাস্তা চওড়া করা, নাগরিক সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে হয়তো কিছুটা নিজেদের ব্যবসায়িক শ্রেণিস্বার্থ থেকেই তুলনায় সজাগ ছিল, কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকরা এসব ব্যাপারে উদাসীন তো ছিলেনই, এমনকি এসব খাতে খরচের বিরোধিতাও করতেন। যেহেতু মিলগুলি থেকেই মিউনিসিপ্যালিটির আয় সবচেয়ে বেশি হত, মিউনিসিপ্যালিটির নীতিনির্ধারণের ইউরোপীয় মিলমালিক ও ম্যানেজারদের জোরই বেশি ছিল। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ইউরোপীয় ম্যানেজারদের আস্তে আস্তে বিদায় সত্ত্বেও, চটকল শহরগুলির পৌরজীবনের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অব্যাহত ছিল।[৬] ভাটপাড়া পৌরসভাও ঔপনিবেশিক আমলের পৌররাজনীতির এই চালচিত্রের বাইরে ছিল না।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের প্রথম তপশিল অনুযায়ী ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় এবং প্রথমে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় ধরনের কমিশনাররাই ছিলেন সরকার মনোনীত। তাঁদের মধ্যে থেকেই চেয়ারম্যান (সাধারণত ইউরোপীয়) এবং ভাইস চেয়ারম্যান (সাধারণত ভারতীয়), উভয়ই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। পরবর্তীকালে বোর্ডের সদস্যদের নিজেদের মধ্য থেকেই ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। বোর্ডের সদস্যদের এমনভাবে মনোনয়ন দেওয়া হত, যাতে করদাতাদের সব অংশেরই প্রতিনিধিত্ব থাকে।[৭] প্রথমে কমিশনারের সংখ্যা ছিল ১৫, পরে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে তা বাড়িয়ে করা হয় ১৯। একটি ওয়ার্ড থেকে একাধিক সদস্য মনোনীত হতেন।[৮]

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের প্রধান উৎস ছিল জমি ও বাড়ির উপর ধার্য কর। এই করদাতা বা Rate Payers-রাই মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য হতে পারতেন। মিল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকেই সবচেয়ে বেশি কর আদায় হত এবং তারপর ছিল গৃহস্থ বাড়ির কর। কাজেই মিউনিসিপ্যালিটিতে মিলমালিকদের আধিপত্য বেশি ছিল। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আদি ভাটপাড়া এবং মূলাজোড় অঞ্চল, যা প্রধানত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল, সেখান থেকে তুলনায় কম কর আসত। অন্যদিকে কাঁকিনাড়া ও জগদ্দল, যেখানে অধিকাংশ মিলগুলি অবস্থিত, সেখান থেকেই বিপুল সংখ্যক কর আসত এবং শ্রমিকদের বিপুল বসতিও ছিল এই অঞ্চলে। কিন্তু তুলনায় এই অঞ্চল থেকে পুরবোর্ডে কমিশনারের সংখ্যা ছিল কম। এই সময় দাবি উঠতে থাকে যে, আদি ভাটপাড়ায় একটি আলাদা পুরবোর্ড (অথবা তাকে নৈহাটি পৌরসভার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হোক) এবং জগদ্দল-কাঁকিনাড়া নিয়ে একটি আলাদা পৌরসভা গঠন করা হোক।[৯] অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। যে ১৯ জন কমিশনারকে নিয়ে ভাটপাড়া পুরবোর্ড এই সময় গঠিত হত, তাঁদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন মিল ও মিলের শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী। অন্যান্যদের মধ্যে ৭ জন হিন্দু করদাতাদের, ২ জন মুসলিম করদাতাদের, ১ জন রেলওয়ের প্রতিনিধি।[১০] পরে অন্যান্য করদাতাদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন করে ১ জন জমিদারদের প্রতিনিধি, ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, ৫ জন হিন্দু করদাতাদের ও ১ জন মুসলিম করদাতাদের প্রতিনিধি করা হয়।[১১] ১৯৩০-এর দশক থেকে অনেক শ্রমিক সর্দার জমিবাড়ির মালিক হওয়ার সূত্রে করপ্রদানকারী হন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে ২ জনকে পুরবোর্ডের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বার্ষিক পৌর রিপোর্টে ভাটপাড়াকে 'the most populous and the most congested of all the mofussil towns' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯২১ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ভাটপাড়া পৌরসভার করদাতার সংখ্যা (rate payers) লক্ষ করলে দেখা যায় যে, মোট করদাতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক-ভগ্নাংশ ছিল মাত্র। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী যেখানে শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬৫,৬০৯, সেখানে করদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৩৩৩ অর্থাৎ মাত্র ৪.৯ শতাংশ (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)।[১২] জনগণনা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৭ : ৩, যা শহরের শ্রমিকদের অস্থায়ী পরিবারবিহীন পরিযায়ী চরিত্র (temporary single migrant character) প্রমাণ করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের পৌর রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হয় যে, একথা স্বীকার করা যেতেই পারে যে, শহরে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, করদাতার সংখ্যা মোটেই সেই অনুপাতে বাড়ছে না। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, এই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল চটকলের কুলি, যাদের নিজস্ব কোনো বাসস্থান ছিল না। তারা মিলকোয়ার্টার বা প্রাইভেট বস্তিতে বসবাস করত এবং প্রকৃত অর্থেই তাদের ভাসমান জনসংখ্যা বা floating population বলা যেতে পারে।[১৩]

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে আঞ্চলিক রাজনীতি বা স্থানীয় রাজনীতিতে ভাটপাড়ায় শ্রমিক অংশগ্রহণের সুযোগ অবশ্য নেহাতই সীমাবদ্ধ ছিল। সবকটি মিলে শহরের চরিত্র ছিল এদিক থেকে একই রকম। ১৯০০ থেকে ১৯৩০-এর দশক পর্যন্ত চটকল শ্রমিকদের পরিযায়ী (migrant) চরিত্র ছিল প্রকট। যার প্রভাব মিউনিসিপ্যালিটির রাজনীতির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

১৯০০ থেকে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাটপাড়া পুরসভার কমিশনার হিসাবে কোনো হিন্দিভাষী প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিল না। স্বাভাবিকভাবে পুরবোর্ডের সদস্য হওয়ার জন্য করদাতা (tax payer) হওয়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ শ্রমিকই ছিল মিলকোয়ার্টার অথবা ব্যক্তিমালাকানাধীন বস্তির ভাড়াটিয়া। ব্রিটিশ সরকার মনে করত যে, পুরপ্রশাসনে এদের কোনো স্বার্থ নেই, তাই পুরসভায় শ্রমিক প্রতিনিধির উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা তারা কোনোদিন অনুভব করেনি। অন্যদিকে চটকলে যুক্ত হওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রথম প্রজন্ম কখনোই শিল্পশহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায়নি। এই সময়পর্বে তাদের একমাত্র লক্ষ ছিল তাদের আয়ের যতটা সম্ভব বড় অংশ দেশের বাড়ি অর্থাৎ তাদের আদিগ্রামে পাঠানো। গ্রামের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ তখনও ছিন্ন হয়নি। শহরের বস্তিজীবনকে তারা সাময়িক বলে মনে করত। ফলে শিল্পশহরগুলির প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশ নেওয়ায় তাদের

কোনো আগ্রহ ছিল না। এর ফলে আমরা বর্তমান অধ্যায়ের শুরুতে দেখিয়েছি যে, মূলত ইউরোপীয় মিল ম্যানেজার ও তাদের সহযোগী বাঙালি ভদ্রলোকরা হিন্দিভাষী শ্রমিক অঞ্চলের ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবাদানের ক্ষেত্রে ছিলেন উদাসীন।

ধীরে ধীরে হিন্দিভাষী শ্রমিকদের একাংশ বাংলায় স্থায়ীভাবে এবং সপরিবারে বসবাস করতে আগ্রহী হয়, যদিও গোড়ায় তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভাটপাড়া পুরসভার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এই সময়পর্বে কিছু হিন্দিভাষী সর্দারের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য তারা বাড়ি-জমি কেনার সুবাদে পুরসভার করদাতায় পরিণত হয় এবং এর ফলে পুরবোর্ডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এরা সপরিবারে বাংলায় স্থায়ী বসবাস শুরু করে, তাদের নানাদিক থেকে স্বার্থপূরণের জন্য পুরসভার প্রশাসনিক ক্ষমতায় অংশীদার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করতে থাকে। আবার ইংরেজ সরকার ও মিলমালিকরাও সর্দারদের হাতে রাখতে চাইত, কেননা শ্রমিকদের তারাই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। গ্রাম থেকে শিল্পাঞ্চলে আসার পর তাদের খাইখরচ জোগানো, আশ্রয়দান, মিলে চাকুরি এবং পরে সময়-অসময়ে প্রয়োজনীয় ধার ও অন্যান্য সাহায্য—সবকিছুর জন্যই তারা সর্দারদের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইভাবে ইংরেজ সরকার ও মিলমালিক এবং সর্দার ও শ্রমিকদের মধ্যে একধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থানীয় রাজনীতিতে হিন্দিভাষী এই সর্দারদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে।

মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পুরবোর্ডের কমিশনাররা কোনোভাবেই নির্বাচিত হতেন না, হতেন মনোনীত। ভাটপাড়া পুরসভায় ১৯৩০-৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আমরা বেশ কয়েকজন হিন্দিভাষী কমিশনারের নাম পাই, যাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন মিলের সর্দার, যেমন—রামপ্রসাদ শা, রামপরিচন সিং, মহঃ তাহির সর্দার, সুরিয়া সিং প্রমুখ। ইতিমধ্যে এঁরা সকলেই ভাটপাড়ায় জমিজমা বা বাড়ির মালিক হওয়ার সূত্রে করদাতায় পরিণত হয়েছেন। সর্দাররা ক্রমশ মিউনিসিপ্যাল রাজনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করলেও, চটকলে কর্মরত হাজার হাজার হিন্দিভাষী শ্রমজীবীরা মিউনিসিপ্যাল রাজনীতিতে তেমন আগ্রহ দেখাত না মূলত তাদের অভিবাসী চরিত্রের জন্য। কিন্তু স্থানীয় রাজনীতির বাইরে মিলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তথা বিধানসভাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ করার মতো। তবে এক্ষেত্রেও বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ করা যায় ১৯২০ দশক থেকে।

প্রাদেশিক তথা মিলকেন্দ্রিক রাজনৈতিক জীবন: ঔপনিবেশিক পর্ব

বাংলার অধিকাংশ শিল্পক্ষেত্রের মতোই ভাটপাড়ার চটকলেও শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং গান্ধির আহ্বানে ভারতজুড়ে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাতের মধ্য দিয়ে। যদিও এই সময়কার অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘটের অধিকাংশই হয়েছিল অর্থনৈতিক কারণে, তাহলেও এই সর্বপ্রথম বিক্ষুব্ধ চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে বাইরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটা যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। বিভিন্ন মতবাদধারী রাজনৈতিক কর্মীরা, উদারনৈতিক রিফর্মিস্টরা বা সংস্কারবাদীরা (এই শব্দবন্ধের দ্বারা বোঝায় যাঁরা শ্রমিকদের শ্রেণিসংগ্রাম বা এমনকি রাজনৈতিক আন্দোলনেও বিশ্বাস করতেন না, শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পথে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তির পথে বিশ্বাসী ছিলেন, সেই শ্রেণিকে), গান্ধিবাদী, র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী এবং খিলাফতপন্থীরা প্রায় সকলেই এইসময় শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন।

রাজনৈতিকভাবে ভাটপাড়া অঞ্চলের চটশ্রমিকদের প্রথম সংগঠিত করার কৃতিত্ব অবশ্যই প্রাপ্য খিলাফতপন্থীদের। তাঁরা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। এর সম্পাদক হন এই অঞ্চলের চটকলের বরখাস্ত শ্রমিক লতাফৎ হোসেন এবং এর সভাপতি হন আব্দুল মজিদ, যিনি স্থানীয় অঞ্চলের 'কার্ল মার্কস' বলে পরিচিত ছিলেন। বস্তুতপক্ষে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভাটপাড়াতেও খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকারীদের যৌথ চেষ্টাতেই আন্দোলন ও সংগঠন প্রাণ পেয়েছিল। এই পর্বে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়নের অফিসে পদার্পণ করেছিলেন।[১৪] কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন পরেও দীর্ঘকাল টিকেছিল, যদিও তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন (ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট ১৯২৬ অনুযায়ী), তবে ক্রমশই এটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত হয়। মালিকপক্ষ, ব্রিটিশ প্রশাসন ও পরে মুসলিম লিগের সঙ্গে এই ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় ছিল। এই ইউনিয়নের দুই প্রধান কর্মকর্তা লতাফৎ হোসেন (মুসলিম) ও কে. সি. রায়চৌধুরী (হিন্দু)—দুজনেই দীর্ঘকাল সরকার মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধি হিসাবে বঙ্গীয় বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। তবে মূলধারার শ্রমিক আন্দোলন থেকে এই ইউনিয়ন ক্রমশই বিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের সময় এখানকার চটকলে যেসব ধর্মঘট হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল স্থানীয় ভিত্তিক (localised)

এবং কম দিনের। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের অবসানের পর অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও আন্দোলনে ভাটা নেমে আসে।[১৫]

তবে ধর্মঘটের ঘটনা কমে গেলেও, সংগঠন হিসাবে ট্রেড ইউনিয়ন একেবারে অলস বা অনুপস্থিত ছিল না। এই পর্বে ভাটপাড়া-নৈহাটি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি চটকলে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। তার মধ্যে প্রধান ছিল ভাটপাড়া লেবার অ্যাসোসিয়েশন, যেটি সংগঠিত করেছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য।[১৬] এরই উত্তরসূরি হিসাবে ধরা যেতে পারে দ্য বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন-কে (অথবা ইউনিয়ন), যা সারা বাংলার চটকল শ্রমিকদের জন্য গঠিত প্রথম সংগঠন। এটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বরাজ্য পার্টির বিখ্যাত নেত্রী সন্তোষকুমারী গুপ্ত ও কালিদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পরিচালিত গৌরীপুর চটকল ধর্মঘটের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিনের ডান্ডি চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল ভারতে এসে ভাটপাড়ায় গেলে, এই ইউনিয়নের কার্যকলাপের দ্বারা বিশেষভাবে মোহিত হয়েছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী দুই বছরেই ইউনিয়নের খরচার অনেকটাই সন্তোষকুমারী গুপ্ত ব্যক্তিগতভাবে বহন করেছিলেন, যদিও ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০০০, তার মধ্যে ৪০০-৫০০ শ্রমিক নিয়মিত ইউনিয়নের চাঁদা দিতেন। ১৯২৩-২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভাটপাড়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ৯টি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। তার মধ্যে গৌরীপুর জুট মিলে একজন শ্রমিকের উপর জনৈক সুপারভাইজারের দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ধর্মঘট তিন মাসেরও বেশি সময় চলেছিল। অন্যান্য ধর্মঘটগুলির অবশ্য সবগুলিই ছিল স্বল্পস্থায়ী।[১৭]

কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ভাটপাড়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দুই প্রধান ব্যক্তিত্ব কালিদাস ভট্টাচার্য, যিনি অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী (radical) ছিলেন এবং সন্তোষকুমারী গুপ্ত, যাঁর নিজস্ব কোনো সংগঠন ছিল না, কিন্তু শ্রমিকদের কাছে জনমোহিনী আবেদন ছিল, তাঁদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সন্তোষকুমারী নিজেকে ইউনিয়নের কাজকর্ম থেকে সরিয়ে নেন।[১৮] গোয়েন্দা পুলিশের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কমিউনিস্টরা চটকল অঞ্চল থেকে জাতীয়তাবাদীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।[১৯] কিন্তু স্পষ্টতই এটা কিছু অতিশয়োক্তি, কারণ বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, কমিউনিস্ট/মার্কসিস্ট মনোভাবাপন্ন সদস্যরা নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ইউনিয়নের মধ্যে তারা একমাত্র শক্তি ছিল না।[২০]

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের মধ্যে বাংলার প্রায় সবকটিই চটকল অঞ্চলে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের শাখা স্থাপিত হয়, এর সবগুলি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড প্রেজেন্টস (WPP) পার্টির অনুমোদিত শাখা ছিল এবং মূল সংগঠনের কোনো না কোনো সদস্যের তত্ত্বাবধানে সেগুলি চালিত হত। যদিও সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কালিদাস ভট্টাচার্য ও কালীকুমার সেনের উপর ছিল।[২১]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই ইউনিয়নের অফিস বা মূলকেন্দ্র ভাটপাড়া থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু কেবলমাত্র ভাটপাড়াতেই সমিতির নিয়মিত সক্রিয়তা লক্ষ করা যায়। শুধু আন্দোলন নয়, শ্রমিক স্বার্থে কল্যাণমুখী কাজেও এই শাখা আত্মনিয়োগ করেছিল, যেমন—Workmen Compensation Act অনুযায়ী কারখানায় আহত শ্রমিকদের পাওনা আদায়ের বন্দোবস্ত করা। অন্যান্য শাখাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে ভাটপাড়ার সবচেয়ে বড় পার্থক্য ছিল এই যে, ওইসব কেন্দ্রগুলির কাজকর্ম ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনিয়মিত, শ্রমিক অসন্তোষ শুরু হওয়ার পর ইউনিয়ন নেতারা সেখানে উপস্থিত হতেন, নিয়মিত কোনো সাংগঠনিক যোগাযোগ ছিল না।[২২]

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শিবনাথ ব্যানার্জি (যিনি বামপন্থী হলেও কমিউনিস্ট ছিলেন না) বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রধানত তাঁর উদ্যোগেই ভাটপাড়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সারা বাংলার চটকল শ্রমিকদের সংগঠন হিসাবে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনে পরিণত হয়। কিন্তু কিছুকাল বাদেই লিলুয়া রেলওয়ে ধর্মঘটের সূত্রে তিনি নয় মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইতিমধ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা, যাঁরা সবাই প্রেজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য ছিলেন, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (মার্চ, ১৯২৯) সূত্রে বন্দি হন। কিন্তু কালিদাস ভট্টাচার্য চাঁদপুরে গ্রেফতার হলেও, কারাদণ্ড থেকে শীঘ্র মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পরে তিনি শ্রমিককেন্দ্রে কাজ করা ছেড়ে দেন এবং শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে যুক্ত থাকেন। স্বাধীনতার সময়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাটপাড়া টাউন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন।

কাজেই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভাটপাড়া চটকল শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন, যা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির চেয়ে অনেকটাই কাজের ধারার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও অগ্রসর ছিল, সেখানে সাময়িকভাবে একটা ভাঁটা আসে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। প্রথমত, পূর্ববর্তী পর্যায়ের তুলনায় শ্রমিক আন্দোলন অনেকবেশি সংগঠিত রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, বামপন্থী (বিশেষত অধিকাংশ কমিউনিস্ট) কর্মীরা, যাঁরা সাধারণত মধ্যবিত্ত বাঙালি ছিলেন, রাজনৈতিক আদর্শবাদের দ্বারা

অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে থাকেন। সেই কাজের ধারা আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন (sporadic) ছিল না। তৃতীয়ত, এসব সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন থাকে যে, শ্রমিকরা যাদের অধিকাংশই ছিল হিন্দিভাষী ও পরিযায়ী, তারা কতটা রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল, নাকি অর্থনৈতিক কারণেই তারা বাইরের বাঙালি, মধ্যবিত্ত, রাজনৈতিক কর্মী ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

১৯২০ দশকের মধ্যভাগে ভাটপাড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্ত হওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন একটি নতুন মাত্রা পায়।[২৩] তিনি তখন সদ্য বিদেশ থেকে প্রত্যাগত, বামপন্থী হলেও, কমিউনিস্ট নন। রাজনৈতিকভাবে শ্রমিকদের সংগঠিত করার পাশাপাশি শিবনাথ নিয়মতান্ত্রিক কাজকর্ম করতেন। প্রচলিত আইনের মধ্যে শ্রমিকদের সুবিধার যেসব ব্যবস্থা ছিল তার প্রকৃত সুযোগ যেন শ্রমিকরা পায়, সেদিকে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। যেমন—Workmen Compensation Act অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পাওনা আদায় করা। তাছাড়া ভাটপাড়া শ্রমিক অঞ্চলে তিনি একটি প্রাইমারি স্কুল ও একটি নৈশকালীন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শ্রমিকদের দারিদ্র্যের সুযোগ তাদের উপর ঋণদাতা কাবুলিওয়ালাদের অত্যাচার চলত। শিবনাথের নেতৃত্বে একটি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়, যা কাবুলিওয়ালাদের হাত থেকে শ্রমিকদের অনেকাংশে ঋণমুক্ত করতে পেরেছিল।[২৪] এই সোসাইটি থেকেই জন্ম নেয় Bhatpara Naihati Credit Bank Ltd., যা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে Bhatpara-Naihati Cooperative Bank-এর নামে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত পদে ছিলেন। কার্যনির্বাহী কমিটির বাকি সকলেই ছিলেন ভাটপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা, বাঙালি ভদ্রলোক (যাদের মধ্যে নয়জনই ছিলেন ভট্টাচার্য পদবীধারী ব্রাহ্মণ) এবং একজনও মিলশ্রমিক ছিলেন না, যদিও মূলত শ্রমিকহিতৈষী হিসাবেই তাঁরা এই সময় সমবায় ব্যাংক গড়ে তোলেন। ১২ জন ডিরেক্টরের মধ্যে ৩ জন—শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য ও সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে বাঁচাতে এই সমবায় ব্যাংককে তাঁরা একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে এই লক্ষ্য সাধিত হয়নি। তাহলেও রক্ষণশীল প্রাচীন ভাটপাড়ায় শ্রমিক আন্দোলনকে ঘিরে বামপন্থী আন্দোলনের যে হাওয়া বইতে শুরু করে, তার নমুনা ছিল এই ব্যাংক।[২৫] পরে লিলুয়া রেলশ্রমিক আন্দোলনের সূত্রে তিনি কয়েকবার (১৯২৬-২৭) কারাবরণ

করেন এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে বন্দি হন। মুক্তি পাওয়ার পর হাওড়াকে তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন এবং অচিরেই সর্বভারতীয় শ্রমিকনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ভাটপাড়ার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কমে আসতে থাকে। এখানে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে। এদিকে একটি স্বতন্ত্র কো-অপারেটিভ ব্যাংক হিসাবে বিগত প্রায় ১০০ বছর ব্যাংকটি গৌরবের সঙ্গে টিকে আছে, যদিও শ্রমিকশ্রেণির নিজস্ব সংগঠন হিসাবে যা কল্পনা করা হয়েছিল, সে হিসাবে এটি কখনও গড়ে উঠতে পারেনি এবং মূলত মধ্যবিত্ত ও প্রধানত বাঙালিদের সংগঠন হিসাবেই থেকে গেছে।[২৬]

ভাটপাড়া শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন অর্থাৎ মূলত হিন্দিভাষী অবাঙালি শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালি লোকহিতৈষী ও রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিদের সম্পর্ক নিয়ে যে-কোনো আলোচনায় অবধারিতভাবে যার কথা উঠে আসে, তিনি হলেন কালিদাস ভট্টাচার্য (১৮৮৯-১৯৬৬)।[২৭] রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান কালিদাস কিশোর বয়স থেকেই ভাটপাড়ায় মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় ভাটপাড়ায় স্থানীয় যুবকরা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের রচিত হিন্দিগান গেয়ে হিন্দুস্থানি শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতেন। এই সূত্রে ভাটপাড়ায় প্রথম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যদিও তা কতটা গভীর ছিল, বলা মুশকিল। স্বদেশি আন্দোলনের শেষদিক থেকে যেসব বিপ্লববাদী সংগঠন বাংলাদেশের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল, সেইরকম একটি সংগঠন ছিল ভাটপাড়া জাতীয় সমিতি। কালিদাস এর সঙ্গে যুক্ত হন। পরে প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালীন তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ভারত রক্ষা আইন অনুযায়ী কারারুদ্ধ হন। বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে তাঁরা মুক্তি পেলেন। ততদিনে বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসে, যার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনকে তাঁরা প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন। কালিদাস ভট্টাচার্য ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ভাটপাড়ায় সর্বপ্রথম শ্রমিকদের মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন।[২৮] অবশ্য অন্য কোনো সূত্র থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায় না।

এদিকে ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলন চলাকালে কাঁকিনাড়া অঞ্চলের মালিকপক্ষের অনুগ্রহপুষ্ট কিছু জুটমিল সর্দার ও সরকার মনোনীত কয়েকজন তথাকথিত শ্রমিকনেতার উদ্যোগে কাঁকিনাড়ায় বেঙ্গল লেবার কনফারেন্স নামে এক শ্রমিকসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে মুষ্টিমেয় কিছু স্থানীয় শ্রমিক

ব্যতীত অধিকাংশই ছিলেন বাজারের কিছু দোকানদার ও সর্দারশ্রেণির কিছু মানুষ। এর থেকে জন্ম নেয় Kankinara Labour Union Association, যা নরমপন্থী, সরকার সমর্থক ট্রেড ইউনিয়ন বলেই প্রচলিত ছিল, যা কখনোই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বা শ্রমিকদের মধ্যে কখনোই জনপ্রিয় সংগঠন হয়ে ওঠেনি। তবে দীর্ঘদিন ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট অনুযায়ী এই অঞ্চলের একমাত্র রেজিস্টার্ড ইউনিয়নের মর্যাদা এটি পেয়েছিল। এদিকে কালিদাস ভট্টাচার্য কাঁকিনাড়া জুট মিল, (নৈহাটির) নদিয়া জুট মিল, গৌরীপুর জুট মিল সহ বিভিন্ন মিলে কাজ করেন। কিন্তু আন্দোলন করার অপরাধে সব জায়গা থেকেই তাঁর কাজ চলে যায়। এই পর্বে বিভিন্ন চটকলে তাঁর সহযোগী ছিলেন সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত কালিদাস একটি মুদিখানার দোকান চালিয়ে জীবিকানির্বাহ করতেন। সেইসঙ্গে বিনামূল্যে শ্রমিক ও অন্যান্য দুঃস্থ মানুষের জন্য হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ভাটপাড়া অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রিলায়েন্স জুট মিল, নদিয়া জুট মিল সহ আরও কিছু মিল মিলে শাখা সংগঠন গড়ে ওঠে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে Workers and Peasants Party গঠিত হয় মূলত কমিউনিস্টদের উদ্যোগে। যদিও তখনও পর্যন্ত দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করেনি। WPP-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনের পর ২৪ পরগনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই পার্টির উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া-নৈহাটি অঞ্চল থেকে নিত্যানন্দ চৌধুরী, কালিদাস ভট্টাচার্য, সত্যনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (সত্যমাস্টার) প্রমুখ বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে সীতা শেঠ, দয়ারাম বেরী, গৌরীশঙ্কর গুপ্তা, তিলকাধারী সিং প্রমুখ অবাঙালি হিন্দিভাষী শ্রমিক নেতাদের নাম পাওয়া যায়।[২৯] ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ—১ এপ্রিল WPP-র তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্যান্য পরিচিত কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে কালিদাস ভট্টাচার্য WPP-র কার্যকরী সমিতির সদস্য হন। এই সময় থেকেই শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালিদাস ভট্টাচার্যের মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। শিবনাথ WPP-কে কমিউনিস্ট সংগঠন মনে করে তার সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু কালিদাস ভট্টাচার্য WPP-র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় চাঁদপুরে গোপেন চক্রবর্তী (পরবর্তীকালে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা) ও কালিদাস ভট্টাচার্য গ্রেফতার হন। পরে গোপেন চক্রবর্তীকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে মীরাট নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু কালিদাস ভট্টাচার্যকে মুক্তি

দেওয়া হয় ও তাঁকে মীরাট মামলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[৩০] মুক্তির পর বামপন্থী ও শ্রমিক আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করেন কালিদাস ভট্টাচার্য। যদিও জনজীবন থেকে তিনি কখনও পুরোপুরি সরে যাননি। স্বাধীনতার সময় (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে) তিনি ভাটপাড়া টাউন কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন ও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের জনকল্যাণকামী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক চটকল ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য সর্বসাধারণের কাছে প্রদত্ত আবেদনপত্রে মুজঃফর আহমেদ, নিত্যানন্দ চৌধুরী, বঙ্কিম মুখার্জি, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রমুখ তৎকালীন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে কালিদাস ভট্টাচার্যের নামও পাওয়া যায়।[৩১] ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কালিদাস ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এক স্মরণসভায় ভাটপাড়ার তৎকালীন বল্‌গাহীন সমাজে বিপ্লবীবাদী আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন সবকটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

কিন্তু কেন তিনি প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলন থেকে সরে গিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। তিনি প্রথম জীবনে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী ধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিনা বিচারে বন্দিও ছিলেন, পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন এবং পিজেন্টস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ডোনাল্ড ক্যাম্পবেল নামে জনৈক ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য গোপনে ভারতে এলে তাঁর পাসপোর্ট রাখার দায়িত্ব কলিদাসকে দেওয়া হয়। কিন্তু খুব সহজেই পুলিশ এই পাসপোর্টের সন্ধান পায় ও ক্যাম্পেবেল গ্রেফতার হন। তাঁর মতো মানুষের এই ধরনের গোপনীয় দায়িত্ব পালনে অসতর্কতা বিস্ময়কর। কালিদাস ভট্টাচার্যের গুণমুগ্ধ জীবনীকারদ্বয় এই ঘটনা অস্বীকার করেননি। এদিকে কমিউনিস্ট নেতা মুজঃফর আহমেদ এই ঘটনায় কালিদাস ভট্টাচার্যের পুলিশের সহযোগী ভূমিকার প্রতি ইঙ্গিত করে তির্যক মন্তব্য করেছেন যে, তিনি বড়ই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন।[৩২] সবকিছু মিলিয়ে দেখলে কালিদাসের হঠাৎ করে ট্রেড ইউনিয়ন জগৎ ত্যাগ করার পেছনে কারণ অনুমান করা হয়তো ভুল হবে না। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তার স্বেচ্ছাপসারণের পর ভাটপাড়ার স্থানীয় বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিবাসী অবাঙালি শ্রমিকদের যোগসূত্র স্থাপনের প্রধান সূত্রটি তখনকার মতো শেষ হয়ে যায়, যা পূরণ করা পরবর্তীকালেও সহজসাধ্য ছিল না।

এদিকে সর্বত্র চটকলের সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশই বেড়ে উঠেছিল

তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হাওড়া জেলার দুটি দীর্ঘস্থায়ী চটশ্রমিক ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে। দাবিপূরণের দিক দিয়ে বিচার করলে দুটি ধর্মঘটের কোনোটি সফল হয়নি। কিন্তু এই ধর্মঘটগুলি বিশেষ করে ফোর্ট গ্লস্টার চটকলের ধর্মঘট তার বিশেষ প্রকৃতির দ্বারাই শ্রমিকশ্রেণির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের এক নজির সৃষ্টি করেছিল এবং সারা দেশের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘটের পটভূমি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির এই অসন্তোষ ও জঙ্গি মনোভাব মনে রাখতে হবে।[৩৩]

আইজেএমএ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে স্থির করে যে, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই থেকে আইজেএমএ অনুমোদিত সবকটি মিলে শ্রমিকদের কাজের সময় প্রতি সপ্তাহে ৫৪ থেকে বাড়িয়ে ৬০ ঘণ্টা করা হবে। এর ফলে সম্ভাব্য উদ্‌বৃত্ত প্রায় ৬০ হাজার শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিশ দেওয়া হয়। বহু মিল, যেখানে একাধিক শিফটে কাজ হত, সেখানে একটি শিফটে অধিক ঘণ্টা ধরে পুরানো মজুরিতেই শ্রমিকদের কাজ করানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। চটকলগুলি তাদের ক্রমহ্রাসমান লাভের পরিমাণ ঠিক রাখার জন্য এই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। স্বভাবতই শ্রমিকদের প্রতিবাদ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিরোধের প্রথম চিহ্ন দেখা যায় ভাটপাড়া-জগদ্দলের একগুচ্ছ মিলে, যেখানে অন্যান্য চটকল অঞ্চলের তুলনায় শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের ইতিমধ্যেই এক শক্তিশালী ও দীর্ঘ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছিল তাঁতি বা বয়নকারীরা (weavers)। এটা কিছুটা বিস্ময়কর ছিল, কারণ এরাই ছিল চটকল শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ বেতনভোগী অংশ। কাজের ৫৪ ঘণ্টা শেষ হওয়ার পরেই তারা দলে দলে মিল ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এর ফলে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে মিলের কাজকর্ম এতটাই ব্যাহত হয় যে, মিলগুলি কার্যত বন্ধ করতে হয় এবং প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ে। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, যা শক্তিশালী হলেও আইনত রেজিস্টার্ড ছিল না, বাংলার প্রায় সমস্ত চট শিল্পকেন্দ্রের সভাসমিতি ও লিফলেট বিলির মাধ্যমে ধর্মঘটের পক্ষে প্রচার শুরু করে। জুলাই মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে পুরো ২৪ পরগনা জেলায় ধর্মঘটের প্রভাব পড়ে। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে সারা প্রদেশ জুড়ে সেটি প্রায় এক সাধারণ ধর্মঘটের রূপ নেয়, যার ফলে শুধু কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত সমস্ত মিলের কাজ ব্যাহত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, গঙ্গার অপর পারে হাওড়া ও হুগলি জেলার মিলগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এই ধর্মঘট।[৩৪]

শেষে পুলিশ এবং দুষ্কৃতীদের সাহায্য নিয়েও ধর্মঘট ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে মালিকপক্ষ পিছু হটতে বাধ্য হয়। সরকার মিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে ১৬ আগস্ট এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন—মালিকপক্ষের তরফে আইজেএমএ-র চেয়ারম্যান এবং শ্রমিকদের তরফে প্রভাবতী দাশগুপ্ত (দ্য বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন) এবং কে. সি. রায়চৌধুরী (কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন)। আইজেএমএ সাপ্তাহিক কাজের সময় আবার ৫৪ ঘণ্টা চালু করে এবং ৬০ ঘণ্টা কাজের নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা ধর্মঘট চটকল শ্রমিকদের পক্ষে এক ঐতিহাসিক সাফল্য হিসাবেই শেষ হয়।

সরকার এবং মালিকপক্ষ একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, শ্রমিকদের প্রকৃতই এক অর্থনৈতিক অভিযোগ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যেভাবে ধর্মঘট শুরু হয়, পরিচালিত হয় ও বিস্তৃত হয়, তা থেকে এটা জোরের সঙ্গে মনে করা যেতেই পারে যে, কিছু মাড়োয়ারি কাঁচা পাটের ব্যবসায়ী (Hessian dealers), যারা বিরাট ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল, এই ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তা পূরণ করার সুযোগ পেয়েছে এবং সর্দার ও স্থানীয় দোকানদারদের মধ্যে বহু টাকা ছড়িয়ে তাদের প্রভাবাধীন শ্রমিকদের ধর্মঘটে যেতে উৎসাহিত করেছিল। কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়ন চটকল শ্রমিকদের তখনও পর্যন্ত একমাত্র রেজিস্টার্ড সংগঠন ছিল এবং যে অঞ্চলে ধর্মঘট হয়, ঠিক সেটাই ছিল তাদের কর্মকাণ্ডের জায়গা। কিন্তু এই ইউনিয়ন কোনোভাবেই ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত ছিল না, এমনকি এ বিষয়ে তাদের কাছে পূর্বে কোনো খবরও ছিল না। বরং এই ইউনিয়ন সভাপতি কে. সি. রায়চৌধুরী প্রকাশ্যে জানান যে, এই ধর্মঘটের পেছনে বেআইনি মাদক ব্যবসায়ীদের হাত আছে এবং তাদের ইউনিয়ন এই বেআইনি মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় তাদের প্রভাব খর্ব করার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে সাহায্য করে এবং ধর্মঘটে মদত দেয়।[৩৫] স্বভাবতই বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্ব এইসব বক্তব্যকে অস্বীকার করেছিলেন। যেভাবে ধীরে ধীরে এই ধর্মঘটের বিস্তার ঘটেছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, এর পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না, বরং তা ছিল শ্রমিকদের নিজস্ব প্রকৃত অভাব-অভিযোগের বাহ্যিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন। যাই হোক এই ধর্মঘট থেকে পরিষ্কার যে, ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চলই এই ধর্মঘটের উৎস এবং ঝটিকাকেন্দ্র।

একদিকে ধর্মঘটের প্রায় সমসাময়িককালে ড. প্রভাবতী দাশগুপ্ত, যিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না, বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন এবং কালিদাস ভট্টাচার্যের স্বেচ্ছাবসরের পর সভানেত্রী হিসাবে তাঁর

জায়গায় নির্বাচিত হন। ধর্মঘট শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রভাবতী দাশগুপ্ত, যিনি শ্রমিকদের উপর একজন মোহিনী প্রভাবের অধিকারিণী ছিলেন এবং অন্যদিকে ইউনিয়নের ভেতরের কমিউনিস্ট সমর্থক নেতৃত্ব, যাঁরা অনেক বেশি সাংগঠনিকভাবে সুসংহত ছিলেন তাঁদের অনুগামীদের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে। এর ফলে সর্বত্র শ্রমিক আন্দোলনে অনৈক্য ও দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। ভাটপাড়াও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

কিন্তু আরও অনেক বড় মারাত্মক বিপদ দেখা দিয়েছিল বিশ্বব্যাপী মহামন্দার ফলে, যার সূত্রপাত ঘটে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দেই এবং তা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। স্বভাবতই এর সবচেয়ে বড় আঘাত নেমে এসেছিল শ্রমিকশ্রেণির উপর। কিন্তু সবসত্ত্বেও শ্রমিকরা মুখ বুজে সব আঘাত সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিল, কেননা তারা জানত যে, মালিকপক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাই করার সামান্যতম সুযোগও ছাড়বে না। এই পর্বে যে ক'টি অল্পসংখ্যক ঘটনা ঘটেছিল, সবই ছিল আকস্মিক ও তাৎক্ষণিক। এরকম একটি ঘটনা ছিল ভাটপাড়ার ওয়েভারলি জুটমিলে, যেখানে শ্রমিকরা ম্যানেজারকে আক্রমণ করে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা করে (জানুয়ারি, ১৯৩৩)।[৩৬]

১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে মন্দার প্রভাব কেটে যায় এবং চটকলগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় উৎপাদন শুরু হয়। যুক্তিসংগতভাবেই শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রথম শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র থেকে আইনসভায় শ্রমিক প্রতিনিধি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, যদিও ভোটাধিকার প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের তুলনায় যৎসামান্য ছিল। নির্বাচনের পরে শেষ পর্যন্ত ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক-প্রজা পার্টি—মুসলিম লিগ সরকার বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কংগ্রেসকে অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিরোধী আসনে বসতে হয় (এপ্রিল, ১৯৩৭)।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহ থেকেই চটকলের শ্রমিক ধর্মঘটের প্রবাহ শুরু হয়ে যায়। সূত্রপাত ঘটে প্রথমে হাওড়ায় ও তারপরে বজবজ অঞ্চলে। ইতিমধ্যে বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই ধর্মঘট চলাকালীন অল বেঙ্গল সেন্ট্রাল জুট স্ট্রাইক কমিটি গঠিত হয়। হক মন্ত্রিসভা

এপ্রিল মাসের গোড়ায় ক্ষমতায় আসে। ততদিনে যেসব অঞ্চলের চটকলে ধর্মঘট আগে শুরু হয়েছিল, তা প্রায় সমাপ্তির পথে চলে এসেছিল। কিন্তু নতুন করে ধর্মঘটের জোয়ার শুরু হয় ব্যারাকপুর মহকুমা অঞ্চলে, যার মধ্যে একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল ভাটপাড়া- জগদ্দল অঞ্চল। নিম্নের সারণি থেকে এই অঞ্চলে কীভাবে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছিল তা স্পষ্টতই বোঝা যাবে।[৩৭]

সারণি ২

মিলের নাম	মোট শ্রমিকসংখ্যা	ধর্মঘট শুরু হয়	ধর্মঘট শেষ হয় ও পুরো মাত্রায় কাজ শুরু হয়	ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত মোট শ্রমিকসংখ্যা
আলেকজান্দ্রা	১৪৮৭	২১/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	১৪৩৭
অ্যালায়েন্স নং ১ + ২	৫৩৮৬	২০/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	৪২০০
অ্যাংলো ইন্ডিয়া (লোয়ার)	২৬৮৪	১৭/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২৬৮৪
অ্যাংলো ইন্ডিয়া (মিডল)	৩৯৯৩	১৭/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	৩৯৯৩
অ্যাংলো ইন্ডিয়া (আপার)	২৩৯২	১৮/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২৩৯২
অকল্যান্ড	৩৫২৬	২২/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	৩৫২৬
ক্রেইগ		২১/৪/৩৮		
জগদ্দল	২৫৮৪	১৭/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২৫৮৪
কাঁকিনাড়া (এ)	২৭৩১	১৯/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২৭৩১
কাঁকিনাড়া (বি)	২৬৯৬	১৯/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২৬৯৬
মেঘনা (নর্থ + সাউথ)	৫১১৭	২০/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	৫১১৭
রিলায়েন্স (১ + ২)	৪২০০	২০/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	৪২০০
ওয়েভারলি	২১৪৪	২০/৪/৩৭	৫/৫/৩৭	২১০০

Source: Nirban Basu, *The Working Class Movement, A Study of Jute Mills of Bengal 1937-47*, K P Bagchi & Company, Calcutta, 1994, pp. 107-08.

এই সময় থেকেই সর্বপ্রথম জগদ্দলের শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব কমিউনিস্টদের হাতে চলে যায়। সিপিআই পার্টির একটি দলিলে সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করা হয় যে, এই ধর্মঘট সবচেয়ে জঙ্গি রূপ নিয়েছিল ব্যারাকপুর মহকুমা অঞ্চলে। একদল কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও জঙ্গি শ্রমিকদের গোষ্ঠী মালিক ও পুলিশের কঠোর নির্যাতনের সামনে দাঁড়ায়। এই প্রথম দলীয় নেতৃত্ব ও শ্রমিক সাধারণ (যাদের অধিকাংশই হিন্দিভাষী) নিয়মিত যোগসূত্র স্থাপন করে, পার্টি গোপন সেল থেকে

যতদূর সম্ভব এই সংগঠনের একটি সাংগঠনিক রূপ নেওয়ার চেষ্টা করে, নিয়মিত ঘরোয়া বস্তি মিটিং-এর মাধ্যমে এবং স্থানীয় ভিত্তিতে স্ট্রাইক কমিটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে, সেগুলি মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিল।[৩৮]

কিন্তু এর পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই সময় দেখা দেয়, তা হল সাম্প্রদায়িক মনোভাব চটকল অঞ্চলে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে শুরু করে, তৎকালীন মুসলিম লিগ দলভুক্ত শ্রমমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দির ব্যক্তিগত আনুকূল্যে প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের মধ্য দিয়ে। ২৪ পরগনা জেলার তৎকালীন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশের একটি রিপোর্টে বলা হয় যে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা চরমে উঠেছে কাঁকিনাড়া ও জগদ্দল অঞ্চলে, যেখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুসলিম শ্রমিকরা বাস করত, যদিও নিশ্চিতভাবে হিন্দু শ্রমিকদের তুলনায় তারা ছিল সংখ্যালঘু।[৩৯] সুরাবর্দির বিশ্বস্ত সহযোগীরা মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে মুসলিম লিগের সাহায্যে শ্রমিকদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংগঠিত করেন এবং তথাকথিত হিন্দু নেতাদের ডাকা ধর্মঘটে যোগ দিতে নিবৃত্ত করতে থাকেন। কাঁকিনাড়া অঞ্চলে ধর্মঘটের সময় মুসলিম ও হিন্দু শ্রমিকদের মধ্যে তিক্ততা বাড়তে থাকে, কেননা সাধারণভাবে মুসলিমরা ধর্মঘটে যোগ দিতে উৎসুক ছিল না। জগদ্দলের মেঘনা জুটমিলের এক সর্দার, মুল্লা সর্দার, ধর্মঘটের সময় মেঘনা জুটমিল (নর্থ) সব মুসলিম শ্রমিককে একত্র করে কাজে যুক্ত রেখে মিল চালু রাখে। একদিন এই মুসলিম শ্রমিকরা নিকটবর্তী অ্যাংলো ইন্ডিয়া মিলের (মিডল) হিন্দু শ্রমিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মুসলিমরা প্রতিরোধ করে এবং হিন্দু শ্রমিকরা পরাভূত হয়। এই ধরনের ঘটনার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ বাড়তে থাকে।

কাঁকিনাড়া-জগদ্দল অঞ্চলের ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ধর্মঘটের সময়কাল ঘটনাক্রম থেকে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে রাজনৈতিক দলগুলি এই অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে সংগঠন ও রাজনৈতিক সচেতনতার কাজ শুরু করে, যদিও শ্রমিকদের কাছে অর্থনৈতিক আশু দাবিদাওয়াই প্রধান ছিল। কিন্তু এর সীমাবদ্ধতার কথাও মনে রাখতে হবে যে, তাদের কাজ করতে হয়েছিল সর্দারদের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কাঁচা পাটের ব্যবসায়ী, সুদের ব্যবসায়ী, মদবিক্রেতা প্রভৃতি নানা ধরনের কায়েমি স্বার্থ। এই ধরনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে শ্রেণিসচেতন শ্রমিকের লড়াই সহজ ছিল না। রাজনৈতিক দলগুলি সেই কঠিন পথ বেছে নিতেও চায়নি। দ্বিতীয়ত, সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ শ্রমিকদের একাংশকে অন্য অংশের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, যা

সামগ্রিকভাবে শ্রমিক ঐক্য ও স্বার্থকেই দুর্বল করেছিল। এই সাম্প্রদায়িকতাবোধ, যা আগে ছিল পরোক্ষ ও সুপ্ত (latent) অবস্থায়, এখন থেকে তা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের ঐতিহ্য তৈরি হল, যা পরবর্তীকালে অব্যাহত থাকে।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চটকলের সাধারণ ধর্মঘট শেষ হওয়ার অল্পদিন পরে বিভিন্ন চটকলে দেখা যায় স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন কিছু আন্দোলন। এই ধরনের আন্দোলনের মধ্যে ভাটপাড়া অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য হল—৪/৬/১৯৩৭ তারিখে শুরু কাঁকিনাড়া জুটমিলের স্পিনাদের ধর্মঘট। এর ফলে কারখানার ৪,৫০০ শ্রমিকের সবাই পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং পুরো মিল বন্ধ রাখতে হয়। স্পিনাররা কারখানার কিছু নিয়ম ভঙ্গ করে এবং কিছু দাবি জানাতে থাকে, যেগুলি মিল কর্তৃপক্ষ মানতে রাজি ছিল না। এই অবস্থায় ৪ জুন দুপুরবেলা ম্যানেজার যখন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন, তখন পিছন থেকে হঠাৎ করে ববিন দিয়ে তাকে আক্রমণ করা হয়। তারপরেই কর্তৃপক্ষ পুরো মিল বন্ধ করে দেয়। বিনাশর্তে শ্রমিকরা ৯ জুন কাজে ফিরে যায়। ২৪/৬/৩৭ তারিখে মেঘনা জুটমিলে কম উৎপাদনের জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁত বিভাগে কয়েকজনকে বরখাস্ত করলে, তার প্রতিবাদে প্রায় ৫০০ শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করে। অবশ্য ২৬ জুন বিনা শর্তে তারাও কাজে ফিরে যায়।[৪০]

অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিল (নং ২)-এর প্রায় ২৭০০ শ্রমিক একজন স্পিনারকে বরখাস্তের প্রতিবাদে এবং মিলে শ্রমিকসংখ্যা বাড়ানো ও মেশিন পরিষ্কারের জন্য অতিরিক্ত ২ আনা ভাতা দেওয়ার দাবিতে, যা ইতিপূর্বে মালিকপক্ষ সম্মতি জানিয়েছিল, তা কার্যকরী করার দাবিতে ২৭ জুলাই থেকে ধর্মঘট শুরু করে। মালিকপক্ষ ধর্মঘটীদের জায়গায় কিছু নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে। এর ফলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের একটি অংশ কাজে ফিরে যায়। এদিকে মিল নং ২-এর বরখাস্ত হওয়ার প্রতিবাদে মিল নং ৩-এর শ্রমিকরাও ৩০ আগস্ট থেকে ধর্মঘট শুরু করে এবং সমগ্র মিল বন্ধ করে দেয়। সহানুভূতিসূচক কারণ ছাড়াও ৩ নং মিলের ধর্মঘটীদের দাবিদাওয়া ২ নং মিলেরই অনুরূপ ছিল। মিল কর্তৃপক্ষ দ্রুত ধর্মঘটীদের জায়গায় নতুন লোক নিতে শুরু করে। এর ফলে মিল নং ২-এর মতো ৩ নং মিলেও ধর্মঘটীরা কাজে ফিরতে শুরু করে। ৫ আগস্ট থেকে দুটি মিলেই স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়। স্পষ্টতই ধর্মঘট সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।[৪১]

এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বল্পস্থায়ী ধর্মঘটের প্রবণতা ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ বরাবর চলতে থাকে। সাধারণত কোনো একটি বিভাগে ধর্মঘট শুরু হত এবং তার ফলে অনেকক্ষেত্রেই পুরো মিল বন্ধ রাখতে হত।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি রিলায়েন্স জুটমিলে জনৈক সর্দারকে আক্রমণের অভিযোগে দুজন মহিলা শ্রমিককে বরখাস্ত করলে তার প্রতিবাদে ব্যাচিং (preparing) ডিপার্টমেন্টের ২৫০ জন মহিলা কর্মীর সকলেই ধর্মঘট শুরু করে। পুরো মিলটিই বন্ধ করে দিতে হয় এবং এর ফলে প্রায় ৩০০০ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই ধর্মঘট ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং বিনাশর্তে ধর্মঘটীরা কাজে ফিরে যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মঘটের সামনের সারিতে ছিল মহিলা শ্রমিকরাই।[৪২]

সর্দারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে একজন শ্রমিককে বরখাস্তের প্রতিবাদে এই রিলায়েন্স জুটমিলেই আবার শ্রমিকদের অবস্থান ধর্মঘট শুরু হয় ১৯ এপ্রিল ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে। মিলটি পুরো বন্ধ করে দিতে হয় এবং তাতে ৪৬০০ জন শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪৩] বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের শাখা সংগঠন কাঁকিনাড়া জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতা হাবিবুল্লাহ (বেঙ্গল লেবার পার্টি) এই ধর্মঘটের জন্য কৃতিত্ব দাবি করেন।[৪৪] বস্তুতপক্ষে এই ধর্মঘটের পিছনে আরও গভীর কারণ ছিল। শ্রমিকদের প্রত্যেকের সার্ভিস বুক তৈরি করার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক শ্রমিককে ফটোগ্রাফ জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইউনিয়ন তার বিরোধিতা করে এবং ফ্যাক্টরিতে ঘন ঘন শ্রমিকদের সভা ডেকে তাদের ধর্মঘট চালিয়ে যেতে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু মাস শেষ হতে চললে শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশই হতাশা দেখা দিতে থাকে এবং ফটোগ্রাফ জমা দিতে ইচ্ছুক শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত ৮ জুন থেকে ২৩০০ শ্রমিককে নিয়ে মিলের কাজ শুরু হয়, যার মধ্যে নবনিযুক্ত শ্রমিকরাও ছিল। এবার সকলেই তাদের ফটোগ্রাফ জমা দিয়ে দেয়। মিল কর্তৃপক্ষ ১২০ জন ধর্মঘটীকে কাজে ফেরত নিতে অস্বীকার করে, কারণ তাদের মতে এরা ছিল অবাঞ্ছিত এবং মিলের স্বাভাবিক কাজকর্মের পক্ষে হাঙ্গামাকারী।

১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বাঙালি মালিকানাধীন (propriertery) জুটমিল, কাঁকিনাড়া নফরচন্দ জুটমিলে ১২০ জন Weaver মিল প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় মিলগুলির তুলনায় তাদের কম বেতন দেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট শুরু করে (৬ এপ্রিল, ১৯৩৮)। এর ফলে মিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ৪৮৫ জন কর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কাঁকিনাড়া শাখার সম্পাদক এক বিবৃতিতে জানান যে, শ্রমিকদের পার্শ্ববর্তী মিলগুলির সমতুল্য বেতন দানের ব্যাপারে কোম্পানির পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন না হওয়ায় এবং এই মর্মে শ্রমিকদের বারবার দাবি সত্ত্বেও, কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করায়, বাধ্য হয়ে শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে যেতে হয়। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলার পর ৩০ জুন

আংশিকভাবে আবার মিলের কাজ শুরু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মিলটি পুরোপুরি চালু হয়। ধর্মঘট ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪৫] এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, এই সময়পর্বে ভাটপাড়া অঞ্চলে অধিকাংশ ধর্মঘটই যেখানে স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল, দেশীয় মালিকানাধীন এই চটকলে ধর্মঘট দীর্ঘ প্রায় তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্যর্থতার মধ্যেই শেষ হয়।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বাংলার অন্যান্য চটকল অঞ্চলের মতোই ভাটপাড়ার চটকলগুলিও মোটামুটি শান্ত ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৩০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বিশেষত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রদেশে নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী অকংগ্রেসী মুসলিম লিগ-কৃষক প্রজা পার্টি সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং অন্যদিকে সমস্ত বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলনের জোয়ার চটশিল্পের শ্রমিক আন্দোলনের নানা দিক থেকে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসে। স্বভাবতই অন্যতম বৃহৎ চটশিল্প কেন্দ্র ভাটপাড়া তার ব্যতিক্রম ছিল না। এই সময় থেকেই বাংলায় বহিরাগত শ্রমিকরা তাদের আধা-কৃষক আধা-শ্রমিক চরিত্র পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না পারলেও এবং জন্মভূমির সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি ছিন্ন না হলেও, ধীরে ধীরে কর্মক্ষেত্রের স্থায়ী বাসিন্দা হতে শুরু করে। আন্দোলন বা ধর্মঘট শুরু হলেই দেশে বা মুলুক-এ চলে যাওয়ার মানসিকতা অনেকটা কমতে থাকে। নিজেদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া, চাকুরির নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলনের গুরুত্ব তাদের কাছে ধীরে ধীরে হলেও ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে। আবার ঠিক এই সময়েই বামপন্থী দলগুলি রাজনৈতিক ও আদর্শগত উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই দলগুলির কিছু নিষ্ঠাবান আদর্শে নিবেদিত (dedicated) পুরো সময়ের (wholetime) রাজনৈতিক কর্মী শ্রমিক অঞ্চলের সঙ্গে একটানা নিয়মিত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত মূলত অর্থনীতিকেন্দ্রিক দাবিদাওয়াকে সংগঠিত রাজনৈতিক রূপ দিতে তাঁরা প্রয়াসী হন। এর মাঝখানে অবাঙালি শ্রমিকশ্রেণির মধ্য থেকেও কিছু নেতৃত্বদানে উৎসাহী উপযুক্ত শ্রমিককর্মী উঠে আসেন। সাধারণ বহিরাগত পরিযায়ী শ্রমিক, তাদের থেকে উঠে আসা মুষ্টিমেয় হলেও নিজস্ব নেতৃত্ব এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি বামপন্থী চিন্তায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদের এই ত্রিপাক্ষিক যোগাযোগ শ্রমিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা নিয়ে আসে, যা আগে ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের নিজস্ব জঙ্গি মানসিকতা ও কিছুটা হলেও এই প্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। এর

পাশাপাশি একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক মেরুকরণে একশ্রেণির শ্রমিক নেতার গুরুত্বদান পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছিল। শিল্পশহর ভাটপাড়ার স্বাধীনতা-উত্তরকালের সমাজ ও রাজনীতিতে সম্যক অনুধাবনের জন্য তাই ১৯৩০-এর দশকের শেষার্ধ এক মাইলফলক (milestone) হিসাবে পরিগণিত হয়। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে সর্দারদের ভূমিকার পরিবর্তন ও মিল কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকদের সার্ভিস বুক চালু, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি মাধ্যমে নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (control system) চালু করা শুরু হলে শ্রমিক আইনের সুযোগ গ্রহণ করে শ্রমিক স্বার্থরক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি আন্দোলনমুখী রাজনীতিবিদরা কতটা দূরদর্শিতার সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং প্রচলিত কায়েমি স্বার্থের বিরোধিতা (সর্দারদের প্রভুত্ব) না করে তাদের সহযাত্রী করে নিজেদের সংগঠন বাড়ানোর আপাতত লাভজনক পথ বেছে নিয়েছিলেন, সেই বিষয়গুলি গভীর অনুসন্ধানে দাবি রাখে।

আপাত অসংগঠিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পাশাপাশি এই পর্বে চটকল শ্রমিকদেরও সারা বাংলাতেই সাংগঠনিক স্তরে নানা অগ্রগতি ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল ভাটপাড়া-জগদ্দল শিল্পাঞ্চল। পূর্বতন All Bengal Jute Workers' Union-এর জায়গায় দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা ও টানাপোড়েনের পর গঠিত হয় Bengal Chatkal Mazdoor Union (BCMU)। চটকল অঞ্চলের কর্মরত প্রায় সবকটি ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত এই ইউনিয়নগুলি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। এই কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলের ২৭টি অনুমোদিত শাখা ছিল। জগদ্দল-ভাটপাড়া তার ব্যতিক্রম ছিল না। আবার BCMU-এর অন্তর্ভুক্ত গোষ্ঠীগুলির তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বও চাপা ছিল না।

ভাটপাড়া অঞ্চলের এই বিরোধ ও জটিলতার অনেকগুলি কারণ ছিল। নতুন ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গঠিত বিধানসভার শ্রমিক কেন্দ্রের অন্যতম ছিল ব্যারাকপুর রেজিস্টার্ড ফ্যাক্টরি লেবার কেন্দ্র। ভাটপাড়া ছিল এই অঞ্চলের বৃহত্তম অংশ। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে এই আসনে প্রার্থীপদ লাভ করেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (Bengal Labour Party বা BLP)। BLP-র অন্তর্ভুক্ত ছিল তখন নিষিদ্ধ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। নির্বাচনের সময় এই অঞ্চলে দত্ত মজুমদারের ব্যক্তিগত প্রভাব কম থাকায়, তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ধর্মঘটখ্যাত ড. প্রভাবতী দাশগুপ্তের সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রভাবতী ততদিনে রাজনীতি থেকে আত্মনির্বাসন নিয়ে বাংলার

বাইরে বসবাস করলেও, শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর পুরানো জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পরে দত্ত মজুমদার ড. দাশগুপ্তকে সংগঠনে উপযুক্ত মর্যাদা ও স্থান দিতে রাজি ছিলেন না। এরপর ড. দাশগুপ্ত বিএলপি-সিপিআই গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে-কোনো গোষ্ঠীর, এমনকি ছোটখাটো গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মেলাতে থাকেন। যেমন ওয়ার্কার্স লিগ বলে একটি ছোট্ট বামপন্থী গোষ্ঠীর কর্মী হিসাবে ইন্দু ব্যানার্জি এবং রমণী চক্রবর্তী এই জগদ্দল অঞ্চলে কাজ শুরু করলে, প্রভাবতী তাঁদের সাহায্য করেন। পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসে রায়বাদীরা (এম. এন. রায়ের অনুগামীবৃন্দ) এই অঞ্চলে সংগঠন গড়ার কাজ শুরু করেন। তাঁরাও প্রভাবতীর সাহায্য গ্রহণ করেন। বোঝাপড়া অনুযায়ী প্রভাবতী তাঁর প্রতিষ্ঠিত Barrackpore Jute Workers Union তাঁদের হাতে তুলে দেন এবং নিজে তার কার্যনির্বাহী সমিতির এক সদস্যা হিসাবে থাকেন। এর সম্পাদক হন আখতার হোসেন নামে এক স্থানীয় শ্রমিক। এই ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় হলেও, জগদ্দলে এর সবচেয়ে সক্রিয় শাখা ছিল। রায়বাদীরা ভাটপাড়ার স্থানীয় কর্মীদের সাহায্যে এই ইউনিয়নকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন, যা বিএলপি-সিপিআই মোটেও ভালো চোখে দেখেনি।[৪৬] দত্ত মজুমদার ও প্রভাবতীর অনুগামীদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট। জগদ্দলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দত্ত মজুমদার চটকল শ্রমিকদের তাঁদের সংগঠনে যোগ দিতে আহ্বান জানান। ড. দাশগুপ্তের অনুগামী রাম অবতার নামে সভায় উপস্থিত এক শ্রমিক, দত্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা এবং পূর্ববর্তী ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য যেসব শ্রমিক পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে তাদের পাশে না দাঁড়ানোর অভিযোগ আনেন। উপস্থিত আরও অনেক শ্রমিক তাঁর জবাবদিহি দাবি করে। দত্ত মজুমদারের উত্তর তাদের সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। তুমুল হট্টগোলের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।[৪৭]

বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বের চাইতেও, এই অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলনের বৃহত্তর বিভাজন ঘটেছিল সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে, যখন মুসলিম লিগ নেতা তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দির পৃষ্ঠপোষকতায় ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লিগের (Workers Welfare League) প্রতিষ্ঠা হয়।[৪৮]

১৯২০-এর দশক থেকে এই অঞ্চলের পুরানো শ্রমিকনেতা কাঁকিনাড়া লেবার ইউনিয়নের সম্পাদক, লতাফৎ হোসেনের সঙ্গে যুক্ত হন। জগদ্দল-এর ওয়েভারলি, অ্যালায়েন্স এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিলগুলিতে ওয়েলফেয়ার লিগের তিনটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরা দত্ত মজুমদার ও দাশগুপ্ত—উভয় গোষ্ঠীরই বিরোধিতা করতে

থাকে এবং শ্রমিকদের ভয় দেখাতে থাকে যে, যদি তারা বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সংগঠন ত্যাগ না করে, তাহলে মালিকরা তাদের বরখাস্ত করবে।[৪৯] ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হোলির সময় কাঁকিনাড়ায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেয়। এর পেছনে সম্ভবত লতাফৎ হোসেন ও দত্ত মজুমদারের দ্বন্দ্ব কাজ করেছিল।

দত্ত মজুমদার গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা দেখানোর জন্য এই সময়কালে এই অঞ্চলের বিভিন্ন মিল জুড়ে এক সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ড. দাশগুপ্তও তাদের সমর্থন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি।[৫০] তবে এই অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখিত রিলায়েন্স জুটমিলে এই সময় অনুষ্ঠিত ধর্মঘটগুলিকে এই বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ বলে মনে করা যেতে পারে।

পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে জগদ্দল- ভাটপাড়া অঞ্চলে, বিশেষত ক্রেইগ, অ্যাংলো ইন্ডিয়া, অ্যালায়েন্স এবং আলেকজান্দ্রা জুটমিলগুলিতে বিএলপি-সিপিআই গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়তে থাকে।[৫১] বেশ কিছু বামপন্থী সংগঠক এই অঞ্চলে নিয়মিত আসতে থাকে এবং হাবিবুল্লার মতো স্থানীয় শ্রমিকশ্রেণি থেকে উদ্ভূত নেতা তাদের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই এই সমস্যা একটা নতুন মাত্রা পায়, যখন দত্ত মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আদি বিএলপি গোষ্ঠী ও গণশক্তি গোষ্ঠী (কমিউনিস্ট পার্টি তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ থাকায় তারা তাদের পত্রিকার নামানুসারে গণশক্তি গোষ্ঠী বলে পরিচিত) উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক স্তরে বিরোধ শুরু হয়। সিপিআই গোষ্ঠী জগদ্দল অঞ্চলে তাদের নিজস্ব সংগঠন বাড়াবার চেষ্টা শুরু করে। দত্ত মজুমদার এটা ভালো চোখে নেননি।[৫২]

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জুট অর্ডিন্যান্স ঘোষিত হয়, যার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাসের আশঙ্কা দেখা দেয়। এই আসন্ন বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে সাধারণভাবে একটা আপেক্ষিক ঐক্য লক্ষ করা যায়। যদিও প্রতিবাদী আন্দোলনের ধরন নিয়ে দলগুলির মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে BCMU সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব দেয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মঘটের সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চলের দায়িত্ব পড়ে বিএলপি-সিপিআই জোটের উপর। সরকার ও মুসলিম লিগ সমর্থক তথাকথিত white union-এর কাছ থেকে তাঁরা কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। প্রভাবতী দাশগুপ্তও এই ধর্মঘটের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। যাই হোক ৫ ডিসেম্বর ১৯৩৮ থেকে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু একমাত্র টিটাগড় ছাড়া এই প্রদেশের

কোথাও এই ধর্মঘটের তেমন প্রভাব পড়েনি। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে এই অঞ্চলের হিন্দিভাষী শ্রমিকদের উপর কমিউনিস্টদের প্রভাবের কথা যতই বলা হোক না কেন, তাদের সমস্ত সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি।[৫৩] শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে এই অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহৃত হয়। এরপর থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কিছু স্বল্পস্থায়ী আংশিক ধর্মঘট বিভিন্ন চট অঞ্চলে লক্ষ করা গেলেও, ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চল মোটামুটিভাবে শ্রমিক অসন্তোষের প্রভাবমুক্ত ছিল।

শ্রমিক আন্দোলনের আর-একটি নতুন পর্ব শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক বাজারে চটের ব্যাগ ও অন্যান্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফলে চটের উৎপাদনও বৃদ্ধি করতে হয়। যথারীতি শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টাও বাড়ে। আবার মালিকদের লভ্যাংশও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় শ্রমিকরাও তাদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাতে শুরু করে। শিল্পে উৎপাদনের স্বার্থে সরকারও শিল্পশান্তি বজায় রাখতে উদ্যোগী হয়। ফলে স্বল্পস্থায়ী ধর্মঘটের মাধ্যমে অধিকাংশ জায়গায় শ্রমিকদের দাবিদাওয়া জয়যুক্ত হয়। ভাটপাড়ার ক্ষেত্রেও এইরকম বহু উদাহরণ সহজেই দেওয়া যায়।

অ্যাংলো ইন্ডিয়া মিলগুলির প্রায় ২০০০ শ্রমিক প্রতি টাকায় ছয় পয়সা মজুরি বৃদ্ধি অথবা যুদ্ধকালীন বোনাসের দাবিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর ধর্মঘট শুরু করে। প্রথম ধর্মঘট শুরু করে মিডল এবং লোয়ার মিলের Weaverরা। জগদ্দল মিলের শ্রমিকরা ৪ অক্টোবর ধর্মঘটে যোগ দেয়। কিন্তু একমাত্র মিডল মিল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, বাকি দুটি মিল কমসংখ্যক শ্রমিক নিয়ে কাজ চালাতে থাকে। ৫ অক্টোবর আপার মিলের শ্রমিকরাও ধর্মঘটে যোগ দেয়। এরপর সবকটি মিলই বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে প্রত্যক্ষভাবে ধর্মঘটে না গেলেও মোট ৮৯০০ শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের এক ডেপুটেশন গ্রহণ করেন কিন্তু শ্রমিক ছাড়া কোনো বহিরাগতের সঙ্গে কোনো কথা বলতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। ধর্মঘট চলাকালীন ধর্মঘটের নেতৃত্ব ধর্মঘট আহ্বানকারী কমিউনিস্টদের হাত থেকে বেরিয়ে সরকার সমর্থক white union-এর সমর্থকদের হাতে চলে যায়। এরপর শ্রমিকদের এক প্রতিনিধি দল স্বয়ং শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি জানায় যে, হিসাব করার (calculation) এক পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে সাপ্তাহিক কাজের ঘণ্টা ৪০ থেকে বেড়ে ৫৪ ঘণ্টা হওয়া সত্ত্বেও সমানুপাতিক হারে তাদের বেতন বাড়েনি। তাদের দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ

অভিযোগগুলি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন এবং ইতিমধ্যে শ্রমিকদের কাজে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। ১০ তারিখে দুটি মিল খুলে যায় এবং বাকি দুটি মিল খোলে পরের দিন। বিনাশর্তে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করে।[৫৪]

এই অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুট মিলগুলিতে আবার ধর্মঘট শুরু হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই কাজ নিরূপণ (checking of work) এক পদ্ধতি প্রচলন করার বিরুদ্ধে। এই পদ্ধতি প্রথম চালু হয় মিল নং ২-তে এবং এর কিছুদিন পর কর্তৃপক্ষ অপর তিনটি মিলেও তা সম্প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তারা দাবি করে যে, এই নতুন ব্যবস্থা মিল কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক উভয় পক্ষেরই উপযোগী হবে এবং তুচ্ছ কারণে, শ্রমিক বরখাস্ত হওয়া থেকে বাঁচবে। কর্তৃপক্ষের আরও দাবি ছিল যে, নতুন পদ্ধতিতে যে রেকর্ড রাখা হবে, তা শ্রমিকদের গ্রেডিং দানের ভিত্তি হবে, যা শ্রমিকদের কাজের যোগ্যতা অনুযায়ী ভবিষ্যতে উন্নতির সুবিধা করবে। কিন্তু শ্রমিকদের আশঙ্কা ছিল যে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি ধরা পড়লেই তাদের শাস্তি দেওয়া হবে। ৩ নং মিলের ৩৭৪৪ জন শ্রমিক প্রথম ধর্মঘট শুরু করে, পরের দিন মিল নং ১ এবং ৪-এ তা ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরের দিন মিল নং ২-তে। শ্রমিকদের ধর্মঘট চালানো থেকে নিবৃত্ত করতে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর শ্রমিকদের তরফে এক প্রতিনিধিদল শ্রমমন্ত্রীর কাছে তাদের অভিযোগ জানাতে গেলে, তিনি তাদের অবিলম্বে কাজে যোগ দিতে অনুরোধ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নতুন ব্যবস্থার যাতে কোনো অপব্যবহার না হয়, তা নিয়ে কথা বলবেন। সাধারণ শ্রমিকরাও অবিলম্বে কাজে ফেরত যেতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের তরফে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তার চাইতেও সম্ভবত গুরুতর বিষয় ছিল যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় সর্দাররা ছিল চেকিং-এর দায়িত্বে এবং খুঁতযুক্ত কাপড়কে তারা অর্থের বিনিময়ে পাশ করিয়ে দিত। স্বভাবতই নতুন ব্যবস্থায় তারা সন্তুষ্ট ছিল না। তারা চেয়েছিল ধর্মঘট চলুক, যাতে মিল কর্তৃপক্ষ নতুন ব্যবস্থা চালু না করতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বয়ং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ লেবারের মধ্যস্থতার ফলে শ্রমিকরা বিনা শর্তে ৪ আগস্ট কাজে ফিরে যায়। তিনি শ্রমিকদের আশ্বস্ত করেন যে, শ্রমিকদের কোনো ন্যায্য অভিযোগ থাকলে তিনি নিজে তা তদন্ত করবেন। মিল কর্তৃপক্ষও প্রতিশ্রুতি দেয় যে, এই ধরনের কোনো তদন্তকে তারা স্বাগত জানাবে ও পুরোপুরি সাহায্য করবে।[৫৫]

এই দুটি ধর্মঘট বাদ দিলে ভাটপাড়া-জগদ্দল অঞ্চল ছিল প্রায় সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চটশিল্প নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, সাপ্তাহিক

কাজের ঘন্টা এবং লুমের ব্যবহারের উপর নির্দেশিকা বারবার পরিবর্তিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অন্যান্য অধিকাংশ জায়গার মতো এখানেও শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ছিল বিরল। এর একটি কারণ ছিল যে, যে-কোনো ধরনের আন্দোলনের উপর যুদ্ধকালীন সরকারি নিষেধাজ্ঞা। দ্বিতীয়ত, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্টরা জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণ করে এবং শিল্পে শান্তি বজায় রাখা, উৎপাদন চালু রাখা এবং সরকারি যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে তারা সম্পূর্ণ সমর্থনের কথা বলে। যেহেতু ভাটপাড়া অঞ্চলে বামপন্থীদের মধ্যে কমিউনিস্টদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল তাই তারা আন্দোলনের পথে পা বাড়ায়নি। উলটোদিকে white unionগুলি বরাবরই সরকার সমর্থক হিসাবে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিল। এমনকি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও বিশেষ কোনো প্রভাব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এই অঞ্চলের চটকলগুলির উপরও পড়েনি। কেবলমাত্র অ্যাংলো ইন্ডিয়া মিডল জুটমিলে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর ৮০৮ জন শ্রমিক ক্যামোফেজ ক্লথ (যা যুদ্ধের সময় দরকার) তৈরির জন্য সংশোধিত মজুরি হার, যা তাদের ক্ষতির কারণ হচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মঘট শুরু করে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সদ্যগঠিত কংগ্রেস সমর্থক চটকল মজদুর সেবক সংঘের কর্মীরা এই ধর্মঘটের নেতৃত্ব দেন। ভাটপাড়া অঞ্চলে আগে গোঁড়া গান্ধিবাদীদের কোনো শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়নি। এই ধর্মঘট পরোক্ষভাবে ২১৩৩ সংখ্যক শ্রমিককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। শ্রমদপ্তরের হস্তক্ষেপে শ্রমিকরা বিনাশর্তে ৩০ অক্টোবর কাজে যোগদান করে।[৫৬]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা বাড়ানো এবং লুমের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ফলে শ্রমিকদের রোজগার বৃদ্ধি পায়। চড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাদের যে কষ্ট হচ্ছিল তার থেকে শ্রমিকরা অন্তত আংশিক মুক্তি পায় এবং কর্মচ্যুত কিছু শ্রমিক নতুন কাজের সুযোগ পায়। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আবার সাপ্তাহিক কাজের ঘন্টা ৫৪-তে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং দশ শতাংশ লুমের ব্যবহার কমানোর কথা বলা হয়। এই দুটি সিদ্ধান্তই শ্রমিকদের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এর ফলে বিভিন্ন চটকল অঞ্চলে বেশ কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট দেখা দেয়, তবে অল্পসময়ের মধ্যেই শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়। ভাটপাড়া অঞ্চলে এরকম একটি ধর্মঘট ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে, যেখানে প্রায় তিন হাজার শ্রমিক যুক্ত ছিল। ধর্মঘট শুরু হয় ৫/৫/১৯৪৩ তারিখে এবং শেষ হয় ৭/৫/১৯৪৩ তারিখে, যখন সব শ্রমিকেরা নিঃশর্তভাবে কাজে ফিরে যায়।[৫৭]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে শ্রমিকদের পক্ষে আর-একটি নতুন গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়, যখন সামরিক প্রয়োজনে সেনাবাহিনী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক চটকল অধিগ্রহণ করতে শুরু করে। জগদ্দল অঞ্চলে ক্রেইগ, অ্যাংলো ইন্ডিয়া এবং রিলায়েন্স জুটমিল অধিগৃহীত হলে সেখানকার শ্রমিকদের জীবনে স্থানচ্যুতি ঘটে। সর্বপ্রথম ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ক্রেইগ জুটমিল মিলিটারি কর্তৃক অধিগৃহীত হয় এবং মিলের স্থায়ী শ্রমিকরা তখন থেকে কর্মহীন অবস্থায় থাকলেও, নিয়মিত পুরো বেতন পেত। কিন্তু ওই বছরের অক্টোবর মাসে যখন বাকি মিলগুলি মিলিটারি কর্তৃক অধিগৃহীত হয়, তখন সবকটি মিলের মালিকরা এক মাসের নোটিশ দিয়ে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে এবং প্রস্তাব দেয় অন্য মিলে কাজের সুযোগ করে দেওয়ার। অ্যাংলো ইন্ডিয়া এবং রিলায়েন্স জুটমিলের শ্রমিকেরা গোড়ায় এই প্রস্তাবে রাজি ছিল না, কিন্তু ক্রেইগ জুটমিলের শ্রমিকদের এই প্রস্তাব গ্রহণের কোনো আপত্তি ছিল না। তবুও পার্শ্ববর্তী কোনো মিলে দ্বিতীয় শিফটে কাজের ব্যবস্থা করা খুব দ্রুত সহজ ছিল না। এই অবস্থায় সরকার এক ঘোষণা জারি করে শ্রমিকদের দ্বিতীয় শিফটে বিকল্প কাজের প্রস্তাব গ্রহণ করতে আবেদন জানায় এবং আশা প্রকাশ করে যে, এই বিকল্প ব্যবস্থা অধিকাংশ শ্রমিককে সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু শ্রমিকদের ভাবনা ছিল অন্যরকম। তা ছাড়া দ্বিতীয় শিফটে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা হলেও, ক্রেইগ জুটমিলের উদাহরণ দেখিয়ে তারা দাবি করতে থাকে যে, তাদের বসিয়ে রাখলেও নিয়মিত মজুরি দিয়ে যেতে হবে।[৫৮] ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস শেষ হওয়ার আগেই এই অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিতর্কের একটা নিষ্পত্তি প্রায় হয়ে এসেছিল। রিলায়েন্স জুটমিলের শ্রমিকদের পুরোপুরি এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলের শ্রমিকদের আংশিকভাবে পুনর্বহালের ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্রেইগ জুটমিলের শ্রমিকদের পার্শ্ববর্তী ওয়েভার জুটমিলে কাজের ব্যবস্থা হলেও, কাজের সময় ও মজুরির ব্যাপারে কিছু সমস্যা থেকে গিয়েছিল।[৫৯]

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, সামরিক প্রয়োজনে জুটমিল অধিগ্রহণজাত সমস্যার সমাধান ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। খুব কম সংখ্যক শ্রমিকেরই সামর্থ্য ছিল বিনা রোজগারে শিল্প শহরে থেকে যাওয়ার, তাই তারা মরিয়া হয়ে বিকল্প যে-কোনো কাজ খুঁজতে বাধ্য হয়েছিল। মিলিটারি লেবারের কাজ একটি আকর্ষণীয় বিকল্প ছিল, আবার অনেকেই একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। এই পরিস্থিতি সাধারণভাবে শ্রমিকদের মধ্যে একধরনের মারাত্মক অনিশ্চয়তার জন্ম দেয়। বিশেষত বয়স্ক ও দক্ষ শ্রমিকরা, যারা তুলনামূলকভাবে ভালো বেতন পেত, তাদের সমান

স্তরের বিকল্প কাজের সন্ধান পাওয়া সহজ ছিল না। ভাটপাড়ার মতো বৃহৎ চটকল শহরে এই সমস্যা তীব্র রূপ নিয়েছিল।[৬০]

এছাড়া সাধারণভাবে খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি সবশ্রেণির মানুষের মতোই চটকল শ্রমিকদেরও বিপর্যস্ত ও উত্তেজিত করে রেখেছিল। বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার পরেও, সমস্যার পুরো সুরাহা হয়নি, কেননা এর আগে চটকল শ্রমিকরা নিজ নিজ ফ্যাক্টরি থেকে যে পরিমাণ তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য (cereal) পেত, এখন তার পরিমাণ কমে যায়। ফলে শ্রমিকবিক্ষোভ দেখা দেয় নতুন রেশন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং বর্ধিত ও ভালো মানের খাদ্যসামগ্রী রেশনের সরবরাহ তথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার দাবিতে। সরাসরি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি হলে, শ্রমিকরা কাজে ফিরে যায়। ভাটপাড়া অঞ্চলে এই সময়কার প্রধান ধর্মঘটগুলি সারণি ৩-এ লিপিবদ্ধ করা হল।

সারণি ৩

মিলের নাম	শ্রমিকসংখ্যা	ধর্মঘট শুরু	ধর্মঘট শেষ	কারণ	ফলাফল
অ্যালায়েন্স	৬০০০	২/৫/৪৪	৪/৫/৪৪	উপরোক্ত কারণসমূহ	অসফল
মেঘনা	৫০০ (মোট শ্রমিক ৩০০০)	২/৫/৪	৩/৫/৪	ওই	শ্রমিকরা বিনা শর্তে কাজে ফিরে যায়
নফরচাঁদ	৭৫০	৮/৫/৪৪	১৫/৫/৪৪	ওই	অংশত সফল সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি
অ্যাংলো ইন্ডিয়া (নং ৪)	৪২০০	৬/৫/৪৪	৮/৫/৪৪	ওই	অংশত সফল সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি
মেঘনা	১২০০	১২/৫/৪৪	১২/৫/৪৪	পূর্ববর্তী ধর্মঘটের দেড়দিন যেসব কর্মী কাজে ছিল না, তাদের রেশন দিতে মিল কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানায়	লেবার অফিসারের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি

Source: F.R., May, 1st Half and 2nd Half, 1944.

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের বাকি মাসগুলিতে বিভিন্ন দাবিতে মাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্বল্পস্থায়ী ধর্মঘট ভাটপাড়ায় ঘটেছিল। ওয়েভারলি জুটমিলের মোট ৫০০০ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র ৪০০ জন weavers ১৫ মে ধর্মঘট শুরু করে। তাদের দাবি ছিল সুতোর (yarn) নিয়মিত সরবরাহ, অথবা সুতোর নিয়মিত সরবরাহ না আসা পর্যন্ত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট মজুরি প্রদান। দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি হয় এবং ২২ মে ধর্মঘট শেষ হয়। আবার ২৩ মে, ওই মিলেই ৭৮৫ জন শ্রমিক, যাদের অধিকাংশই স্পিনার, পূর্ববর্তী ধর্মঘটের সময় ১৯-২০ মে মিল কর্তৃপক্ষ যখন কারখানা পুরো বন্ধ রেখেছিল, সেই দু-দিনের মজুরি কাটার প্রতিবাদে ধর্মঘট করে।[৬১] ১৪ আগস্ট মেঘনা জুটমিলের ২০০ শ্রমিক বর্ধিত বেতনের দাবিতে ধর্মঘট শুরু করে। সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি হয় এবং ১৬ আগস্ট ধর্মঘট শেষ হয়। এই ধর্মঘট আংশিক সফল হয়েছিল।[৬২]

কমিউনিস্টরা, যাঁরা জনযুদ্ধের সময় নিষ্ঠার সঙ্গে যুদ্ধ প্রয়াসে কোনো বাধা নয় নীতিতে অবিচল ছিলেন, তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন, যে নানা কারণে সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে ক্রমশই বিক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছে। এই বিক্ষোভগুলিকে কেন্দ্র করে আন্দোলন ও সংগঠনকে একটি সংহত রূপ দিতে এবং একই সঙ্গে যাতে কোনো ভাবেই বল্গাহীন জঙ্গি তার পথে না যায়, সেই জন্য তাদের খুব সাবধানী পথ বেছে নিতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (BPTUC) এবং বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন উভয়ের উপরেই কমিউনিস্টদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও অন্যান্য দল ও গোষ্ঠীগুলি তখনও পর্যন্ত এই দুটি সংগঠনের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ (controlling) ক্ষমতা ছিল না। এই অবস্থায় BPTUC-র উদ্যোগে গঠিত হয় জুট কমিটি, যারা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর থেকে চটকল অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সারা বাংলার প্রতিটি চটকল অঞ্চলে সভা ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের পর এই প্রথম ২৩টি জুট ওয়ার্কার ইউনিয়ন, যাদের সম্মিলিত সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০,০০০, বাংলা সরকারের কাছে একটি কোর্ট অফ ইনকোয়ারি গঠন করে নিম্নলিখিত দূরপ্রসারী প্রশ্নগুলি বিবেচনার (adjudication) জন্য পাঠানোর আবেদন জানায়—মহার্ঘ ভাতার যুক্তিসংগত বৃদ্ধি, ন্যূনতম মজুরি স্থির করা, মিল বন্ধ থাকাকালীন পুরো বেতন দান, চাকুরির নিরাপত্তা (security) এবং স্থায়ীকরণ (permanency), প্রফিট বোনাস ও বৃদ্ধ বয়সে পেনশন।[৬৩] এই ব্যাপক প্রচার আন্দোলন শেষ হয়েছিল BPTUC-র ডাকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩ ডিসেম্বর,

জগদ্দলের গোলঘর ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায়। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী প্রায় ২০,০০০ শ্রমিক এতে যোগ দিয়েছিল। সরকারের হিসাবেও ন্যূনতম ৭০০০ শ্রমিক উপস্থিত ছিল। সভার সভাপতিমণ্ডলীতে ছিলেন এরশাদ (সিপিআই) এবং সীতা শেঠ (বলশেভিক পার্টি)। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা তখনও সুসংবদ্ধ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, কোনো জঙ্গি আন্দোলনের ভাবনা তাঁদের ছিল না।[৬৪]

এরপর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক আগে BPTUC-র উদ্যোগে চটকল শ্রমিকদের একটি সভা হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুন জগদ্দলে। এই সভায় এক প্রস্তাব গ্রহণ করে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয় যে, চট শ্রমিকদের চাকরির শর্ত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি স্থির করার জন্য অবিলম্বে এক ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন ডাকা হোক। কিন্তু সরকার যদি এই দাবি পূরণ না করে, তাহলে কীভাবে আন্দোলনের পথে যাওয়া হবে, তা নিয়ে BPTUC-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে আসে। সংগঠনের মধ্যে প্রায় নিরঙ্কুশ প্রভাবশালী সিপিআই তখনও পর্যন্ত, এমনকি একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটেরও বিরোধী ছিল।[৬৫]

মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫) থেকে স্বাধীনতা লাভ (আগস্ট, ১৯৪৭) পর্যন্ত সময়কাল ছিল আঞ্চলিক ও জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে ঘটনাবহুল, অন্যদিকে শিল্প ও শ্রমিকের ক্ষেত্রেও নানা আন্দোলনে উদ্‌বেল। চটকল কেন্দ্রগুলি তার অন্যথা ছিল না। যদিও রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াই ছিল চট শ্রমিকদের কাছে প্রধান বিষয়। চটকল মালিকদের সংগঠন IJMA নিজেও স্বীকার করেছে যে, অন্তত আংশিকভাবে হলেও চটশ্রমিকদের কিছু ন্যায্য দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া দরকার, যেমন—চাকরির নিরাপত্তা, কাজের উন্নততর পরিবেশ, শিল্পের ভেতরেই একই কাজের জন্য বেতনক্রমের মধ্যে সমতা আনয়ন (standardisation), অবসরকালীন পেনশন ইত্যাদি সুবিধা সাধারণ শ্রমিকদের অন্তত কিছু সন্তুষ্ট করবে; দ্বিতীয়ত, এখানে আলোচ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিপরীতে স্বাস্থ্যকর ও সাংবিধানিক ট্রেড ইউনিয়ন কার্যাবলিকে উৎসাহিত করা উচিত। সরকারও মোটামুটি এই কৌশলী নীতির অবলম্বনে পক্ষপাতী ছিল। এই সময়কার অধিকাংশ আন্দোলন ও ধর্মঘটও ছিল অর্থনীতিকেন্দ্রিক ও স্বল্পমেয়াদি। ভাটপাড়ার চিত্রটা এই সাধারণ চিত্রের কিছু আলাদা ছিল না। এই সময়ের অধিকাংশ ধর্মঘট ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং অর্থনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে স্বতঃস্ফূর্ত।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা ঘোষিত হলে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিপিআই জগদ্দল অঞ্চলের চটকল শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং তা ধীরে ধীরে অন্যান্য চট-অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী তিন মাস এই প্রচার ব্যাপক আকার নেয়। ঠিক এই সময়টাই ছিল নির্বাচনী প্রচারের কাল। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সমাবেশের পর সিপিআই এবং বিসিএমইউ যৌথভাবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর জগদ্দলে এক কেন্দ্রীয় সমাবেশের আয়োজন করে। সংগঠকদের মতে এই সম্মেলনে প্রায় ১৫,০০০ শ্রমিক যোগ দেয়। সম্মেলন থেকে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হয় প্রতিটি মিলে আগামী এক মাসের মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক কমিটি গড়ে তুলতে হবে, যা আসন্ন সংগ্রামের প্রথম ধাপ। কমিউনিস্টদের তরফে অভিযোগ করা হয় যে, এই সভা ভণ্ডুল করার জন্য অনেক মহল থেকে চেষ্টা চালানো হয়। একটি স্থানীয় হিন্দি সংবাদ পত্রিকা *গোস্বামী বিদ্যার্থী*-র ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৫-এর সংখ্যায় বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশিত হয় যে, স্থানীয় শ্রমিক কেন্দ্রের বিধায়ক নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, যিনি ইতিমধ্যে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, ওই একই দিনে একই সময়ে এবং একই স্থানে সভা করবেন। সরকারি রিপোর্টে বলা হয় যে, এই সভায় শ্রমিকদের উপস্থিতির হার তুলনামূলকভাবে কম ছিল, সম্ভবত কংগ্রেস সমর্থকদের প্রচার ও কৌশলের দরুন।[৬৬]

এইভাবে আসন্ন নির্বাচনের আগে ভাটপাড়ার শ্রমিক রাজনীতি ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠে। মূলত চারটি রাজনৈতিক শক্তি এখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয়—সিপিআই, বলশেভিক পার্টি (পূর্বতন বেঙ্গল লেবার পার্টি ততদিনে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে এবং তাদের একটি অংশ বলশেভিক পার্টি গঠন করেছে), কংগ্রেস (পূর্বতন বেঙ্গল লেবার পার্টির বিধায়ক নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁর অনুগামী সহ কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, যদিও দত্ত মজুমদারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাও সংগঠনে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না এবং কংগ্রেসের নিজস্ব সংগঠনও এখানে বিশেষ কিছু ছিল না) এবং মুসলিম লিগ নেতা সুরাবর্দির অনুগামীরা, যাদের নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন হিসাবে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ লেবার গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফল থেকে দেখা যায় যে, চটকল অঞ্চলের সবকটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস প্রার্থীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে; অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলি, যেমন বলশেভিক বা রায়বাদীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মুসলিম সমর্থিত প্রার্থী তৃতীয় স্থান দখল করে। ব্যারাকপুর ফ্যাক্টরি লেবার কেন্দ্রের যার প্রধান একটি অংশ ছিল ভাটপাড়া, ফলাফল এই একই ধারাকে অনুসরণ করে। আঁটোসাঁটো পুরানো সংগঠনের ঐতিহ্য না থাকলেও, কংগ্রেস প্রার্থীর এই সাফল্য এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদের যে জোয়ার এসেছিল, হিন্দিভাষী শ্রমিকরাও স্বভাবতই তাতে আপ্লুত হয়েছিলেন, অর্থনৈতিক সংগ্রামে কমিউনিস্টদের সহযোগী ভূমিকাকে অস্বীকার না করেও। 'আজাদিকে লিয়ে কংগ্রেস, আর রোটি কে লিয়ে লাল ঝান্ডা'—এই শ্লোগানটি সত্যই ছিল শ্রমিকদের শুধু মুখের কথা নয়, মনের কথা।

কিন্তু নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরেও কমিউনিস্টরা চটশ্রমিকদের মহলে অলস হয়ে পড়েনি। যদিও তাদের আন্দোলন সংগঠিত করার কোনো চেষ্টাই তখন তেমন সফল হয়নি। এর পরে পরেই আসে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (আগস্ট, ১৯৪৬)। অন্যান্য অংশের তুলনায় সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানির তুলনামূলকভাবে কম হয়েছিল। যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উসকানির কারণ থাকলেও, ভাটপাড়ার চটকল অঞ্চলেও এর ব্যত্যয় দেখা যায়নি। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কিছুটা কমে এলে কমিউনিস্টরা চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে আবার সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করে। কিন্তু একটি দাবি-সনদ তৈরি করে সাধারণ ধর্মঘট ডাকার কথা তারা চিন্তা করলেও, তা তখন সফল হয়নি। এমনকি স্বাধীনতার প্রাক্কালে সিপিআই প্রভাবিত BPTUC-র আহ্বানে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মে গোন্দলপাড়ায় এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়, মালিকপক্ষ ও সরকারকে বেতন কমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্যকর করতে কীভাবে বাধ্য করা যায়, তার পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার জন্য। পুরো মে ও জুন মাস ধরে এই দাবির সমর্থনে প্রতিটি চটকল অঞ্চলে মিছিল সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এরকম একটি সমাবেশ হয়েছিল জগদ্দলে ২৮ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে।[৬৭]

কমিউনিস্টরা যখন আন্দোলনের নানা প্রস্তুতি নিচ্ছিল, কংগ্রেসীরাও কিন্তু তখন নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল না। ইতিমধ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সমর্থক সব ট্রেড ইউনিয়নগুলি এআইটিইউসি থেকে বেরিয়ে আইএনটিইউসি গঠন করে (মে, ১৯৪৭)। অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও তার রাজ্যভিত্তিক কমিটি গঠিত হয়। শিল্পভিত্তিক কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন (apex)গুলিতেও বিচ্ছিন্নতা আসে। বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের বদলে কংগ্রেস সমর্থক চটকল শ্রমিক ইউনিয়নগুলি

নবগঠিত বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের (BJWF) অন্তর্ভুক্ত হয় (যেটি ছিল আইএনটিইউসি-র শাখা সংগঠন)। ভাটপাড়াতেও প্রতিটি মিলভিত্তিক কংগ্রেস সমর্থক ইউনিয়ন গড়ার কাজও শুরু হয়।[৬৮]

কমিউনিস্ট সমর্থিত বিসিএমইউ এবং কংগ্রেস সমর্থক বিজেডাব্লুএফ-এর মধ্যে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার প্রশ্নের তেমন কোনো মতানৈক্য না থাকলেও, শ্রমিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও পন্থা নিয়ে তাদের মতপার্থক্য স্পষ্ট ছিল। আসন্ন স্বাধীনতার পর কেন্দ্রে ও সদ্যবিভক্ত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস শাসন প্রতিষ্ঠা ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্রের চটশিল্পে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ার উপর স্বাভাবিকভাবেই সরকারের সর্বাধিক গুরুত্ব পড়েছিল, বিশেষত চটশিল্প যখন সবদিক থেকেই ছিল বাংলার বৃহত্তম শিল্প। কাজেই স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের নতুন ধরনের শ্রম-সম্পর্ক, সরকার, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের নতুন সমীকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হয়ে উঠল চটশিল্প।

উপসংহার

বাংলার হিন্দিভাষী চটকল শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিবিম্বই লক্ষ করা যায় ভাটপাড়া মিল শহরের শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। একদা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানরূপে পরিচিত ভট্টপল্লীর কালক্রমে ঔপনিবেশিক যুগের চটকল শহরে পরিণত হয়। পৌরসভা হিসাবে ভাটপাড়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। মূলত ১৮৯০-এর দশক থেকে উক্ত অঞ্চলের চটকলগুলিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অভিবাসন উক্ত অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি তথা রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভাটপাড়ার শ্রমজীবীদের জীবনকে রাজ্য, মিল অভ্যন্তরীণ বা স্থানীয় স্তরে ভাগ করে আলোচনা সম্ভব নয়, কারণ এই সময়পর্বে এই সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা গড়ে ওঠেনি। মূলত অন্যান্য অঞ্চলের মতো ভাটপাড়াতেও ১৯২০-এর দশক থেকেই সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে খিলাফতপন্থীদের হাত ধরে। যদিও খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই ইউনিয়নের কার্যকারিতাও লোপ পায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভাটপাড়া লেবার অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে যেটি পরবর্তীকালে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন নামে পরিচিতি লাভ করে। এই সময় জুড়ে ভাটপাড়ার বিভিন্ন জুটমিলে বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের চিত্র পাওয়া যায়। তবে ১৯২৭

খ্রিস্টাব্দ থেকে পেজেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টদের সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার ফলে শ্রমিক আন্দোলনে জোয়ার আসে। ১৯২৯, ১৯৩৭ ও ১৯৩৯-এর চটকল শ্রমিকদের বিখ্যাত ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ১৯৪১-এ মহাযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য। তবে রাশিয়ার মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতের অন্যান্য শ্রমিক অঞ্চলের মতো ভাটপাড়াতেও কমিউনিস্টরা জনযুদ্ধের জিগির তুলে শ্রমিক আন্দোলন যাতে না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তবে মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন আবার গতি পেলেও, স্বাধীনতা ও তৎজনিত দাঙ্গার পরিস্থিতিতে শ্রমিক আন্দোলনে সাময়িক ভাটা নেমে আসে। এই সময়পর্বের শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, শ্রমিক নেতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল বহিরাগত, চটকলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবে চটকল শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আন্তরিক, শ্রমিকরা এই বহিরাগত নেতাদের অভিভাবক বলেই মনে করত। কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই শ্রমিকদের স্থানীয় সমস্যা জাতীয় রাজনীতির অংশ হতে পেরেছিল, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র

১। এবং সমরেশ বসু, *জগদ্দল*, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, *সমরেশ বসুর রচনাবলী*, ২০১৭, পৃ. ৬৬-৬৯।

২। Bhatpara Municipality, *Annual Administration Report*, 1925-26, p. 1.

৩। পরেশ পাল, *শতবর্ষের ভাটপাড়া*, ভাটপাড়া পৌরসভা ১৮৯৯-১৯৯৯ শতবর্ষের স্মারক পুস্তিকা, ভাটপাড়া পুরসভা ১৯৯৯, পৃ. ১।

৪। *ভাটপাড়া পৌর প্রতিবেদন*, ২০০০, পৃ. ২।

৫। Bhatpara Municipality, *Ibid*, 1922, p. 2.

৬। সৌমিত্র শ্রীমানী, 'মিউনিসিপ্যালিটি ও মিল: বরানগর উনবিংশ শতকের শেষভাগ', *ইতিহাস অনুসন্ধান*, খণ্ড ১১, ১৯৯৬।

৭। Bhatpara Municipality, *op.cit.*, 1922, p. 2.

৮। Bhatpara Municipality, *op.cit.*, 1924-25, pp. 1-2.

৯। *Calcutta Gazette*, 16th July, 1924, Government of West Bengal, Notification No. 3242 M., Dated 8th July.

১০। Bhatpara Municipality, *op.cit.*, 1926-27, p. 2.

১১। Bhatpara Municipality, *op.cit.*, 1929-30, p. 2.

১২। Bhatpara Municipality, *op.cit.*, 1923-24, p. 3.

১৩। *Ibid*, p. 3.

১৪। Ira Mitra, 'Growth of Trade Union Consciousness among Jute Mill Workers 1920-40' (Article*), Economic and Political Weekly*, Special Number, November, 1981.

১৫। Sanat Bose, 'Industrial Unrest' and Growth of Labour Unions in Bengal, 1920-1924', *EPW*, Vol. 16, No. 44/46, Special Number, Nov, 1981, p. 1849-60.

১৬। Ira Mitra, *op.cit.*

১৭। *এআইটিইউসি বুলেটিন*, ২য় খণ্ড, সংখ্যা ৯-৪০, মার্চ-এপ্রিল, ১৯২৬

১৮। Shibnath Banerjee, *Oral Transcript*, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, also, Sutapa Sengupta, *Persecution and Protest: Women Workers and Their Spokeswomen in Colonial Bengal*, Lambert, 2019, pp. 71-78.

১৯। Ira Mitra, *op.cit.*, also, GoB, Home (poll) secret file no-375/1931.

২০। Ira Mitra, *op.cit.*

২১। *IB Report*, Calcutta, File no. 320/1928, Queted in Panchanan Saha, *History of the Working-Class Movement in Bengal*, 1978, pp. 112-13, also Nirban Basu, *The Working-Class Movement, A Study of Jute Mills of Bengal 1937-47*, Calcutta, 1994, p. 58.

২২। West Bengal State Archives (WBSA), *Commerce Department*, File 3c-1, April, 1930, Nos. 13-18.

২৩। Sajal Basu, *In Quest of Freedom: Shibnath Banerjee and His Times,* Calcutta, 1990, Ch. 3.

২৪। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষৎকার, *যুগের ডাক*, জুলাই, ১৯৮৮।

২৫। ড. মণিলাল খান, 'ভাটপাড়া-নৈহাটি সমবায় ব্যাংকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়', *নৈহাটি কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিমিটেড স্মরণিকা,* ভাটপাড়া, ২০০১ অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ।

২৬। নির্বাণ বসু, 'শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাটপাড়া নৈহাটির শ্রমিক আন্দোলনের একটি অধ্যায়', *তদেব*।

২৭। অরুণ কুমার ভট্টাচার্য ও বিমলেন্দু ভট্টাচার্য, *অবিসংবাদিত শ্রমিক নেতা বিপ্লবী কালিদাস ভট্টাচার্য*, ভাটপাড়া, ২০১৯, পৃ. ১০-১৪।

২৮। *দেশহিতৈষী*, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৪, ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত চটকল শ্রমিক সম্মেলনে

সীতারাম গুপ্তর ভাষণ।

২৯। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানু দেব দত্ত সম্পাদিত, *বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৬২।

৩০। *তদেব*, পৃ. ৩৪৫।

৩১। পানিহাটিতে অনুষ্ঠিত উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাদশ সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত *স্মরণিকা* অন্তর্ভুক্ত ভানু দেব দত্তের প্রবন্ধ।

৩২। মুজফ্‌ফর আহমেদ, *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি* ১৯২০-২৯, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৩৭০-৩৭১।

৩৩। Nirban Basu, *op.cit.*, pp. 61-63.

৩৪। বিস্তৃত বর্ণনার জন্য সুকোমল সেন, *ভারতের শ্রমিক আন্দোলন* ১৮৩০-২০১০, ২০১৫, পৃ. ২৬৩-২৬৫।

৩৫। Government of India, New Delhi, *Report of the Royal Commission on Labour in India*, 1931, Vol. 5, Part 2, p. 144.

৩৬। Tanika Sarkar, *Bengal, 1928-1934: The Politics of Protest*, Delhi, 1987, p. 49.

৩৭। *Weekly Report on Indutrial Disputes* – 17/04/1937, 24/04/1937, 01/05/1937, 08/05/1937, quated in Nirban Basu, *op.cit.*, pp. 107-08.

৩৮। National Book Agency, Kolkata; *The Communist*, Volume 1, No. 19, July, 1937, 'The Jute Strike and The Marxists', Statement of the Polite Bureau, Documents of Communist Movement in India.

৩৯। WBSA, Home Political, Confidential File No. 128/37.

৪০। WBSA, *Monthly Report on Industrial Disputes*, July, 1937 Dt. 27.8.37 Govt of Bengal, (poll) conf. File 128/37.

৪১। W.R.I.D – 27/08/37 এবং 28/08/37. WBSA, Weekly Report on Industrial Disputes (WBID).

৪২। WBSA, W.R.I.D, 14.1.38, 22.1.38 এবং *Amritbazar Patrika*, 12/01/38.

৪৩। WBSA, W.R.I.D, 23.4.38, 30.4.38.

৪৪। Government of Bengal (GoB), *Home Department: Calcutta Police, Special Branch (Office of the Deputy Commissioner) File No. 502/39. Report*, dtd. 4.5.1938.

৪৫। *Amritabazar Patrika*, 11/04/38, WRID 21.4.38, *Forthnightly Report Bengal*, April 2nd Half, 1938, also, GoB, *Monthly Report on Industrial Disputes* for June, 1938.

৪৬। GoB, *Home Department: Calcutta Police, Special Branch (Office of the Deputy Commissioner) File No. 502/16.*

৪৭। GoB, *Home Department: Calcutta Police, Special Branch (Office of the Deputy Commissioner) Report*, dtd. 30.8. 1937.

৪৮। Nirban Basu, *Ibid*, pp. 125-26.

৪৯। GoB, *Home Department: Calcutta Police, Special Branch (Office of the Deputy Commissioner) Reports*, dtd. 23.4.38, 26.4.38.

৫০। *Ibid*, Report, dtd. 25.8.38.

৫১। *Ibid*, *Report*, dtd. 9.4.38.

৫২। *Ibid*, *Report*, dtd. 25.8.38.

৫৩। WBSA, *Fortnightly Report*, Bengal, 1st Half, Dec, 1938.

৫৪। WBSA, WRID, 7.10.38, 14.10.38, also, *F.R Bengal*, 1st Half, October, 1939.

৫৫। WBSA, WRID, 24.7.41, 31.7.41, 14.8.41.

৫৬। WBSA, WRID, 6.11.42.

৫৭। WBSA, WRID, 13/5/43.

৫৮। *F.R. Bengal*, October, 2nd Half, and December 1St Half, 1943 also *Capital*, Dec 16, 1943, p. 88, 89.

৫৯। *F.R. Bengal*, 2nd Half Dec, 1943.

৬০। *Peaples' War*, 29.4.43; Article by Indrajit Gupta.

৬১। *F.R. Bengal*, May, 2nd Half, 1944.

৬২। *Weekly Report on Labour Situation*, 24/8/44.

৬৩। *WRID*, 12/10/44.

৬৪। *AITUC File No 55 of 1944-45*, NMML collection.

৬৫। Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, *F.R Bengal*, May, 2nd Half, 1945, also *AITUC File no. 49*, Report dt 6.6.45.

৬৬। Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi,*F.R. Bengal*, 1st Half, July, 1946.

৬৭। *স্বাধীনতা*, ২৪/৬/১৯৪৭।

৬৮। WBSA, *I.B. Report*, Sl. No-259 & 293, File No- 456/47, 456/47 (i), Sub- Indian National Trade Union Congress, Dated 03/05/1947.